ভাসমান জলজ উদ্ভিদ

বিজন কুমার মণ্ডল
মনোজরঞ্জন ঘোষ



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

ভাসমান জলজ উদ্ভিদ

ডঃ বিজন কুমার মণ্ডল
এম. এস-সি. (এজি), পি. এইচ-ডি.
শস্যবিজ্ঞান বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
মোহনপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

ডঃ মনোজ রঞ্জন ঘোষ
এম. এস-সি. (এজি), পি. এইচ-ডি.
কৃষি কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
মোহনপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

BHASAMAN JALAJ UDVID
(Aquatic Floating Plants)
BIJAN KUMAR MANDAL
MANOJ RANJAN GHOSH

প্রকাশকাল : প্রথম সংস্করণ :—মার্চ, ১৯৯০

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (নবমতল)
কলিকাতা—৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা—৭০০ ০৫৪

মূল্য : এগার টাকা

Published by Shri Shibnath Chatterjee, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নদী নালা, পুকুর, খাল বিল ও ডোবার সংখ্যা কম নয়। এই জলে জন্মায় বহুপ্রকার জলজ উদ্ভিদ, সেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি মানুষের নানা কাজে লাগে। কিছু উদ্ভিদ আবার ক্ষতিকারকও বটে, যেমন কচুরীপানা, পিস্টিয়া, ইত্যাদি। এই দুর্নিবার জলজ আগাছা মশা প্রভৃতি কীটপতঙ্গের জন্মের সহায়ক। সবুজ অবস্থায় তুলে মাটিতে পুঁতে পচিয়ে কিন্তু এর থেকে ভাল সার পাওয়া যায়।

উপকারী জলজ উদ্ভিদের মধ্যে য়্যাজোলার স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। চাষ আবাদের ক্ষেত্রেও এর বহু উপকারিতা আছে। প্রবহমান নাইট্রোজেন চক্রাবর্তনে এটিকে বলা হয় নাইট্রোজেনের উৎস। ধীর প্রবহমান বা আবদ্ধ জল যখন দূষিত হয়ে মানুষের ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে তখন সেখানে য়্যাজোলা বা এই জাতীয় জলজ উদ্ভিদ জন্মালে সহজেই জল পরিশ্রুত হয়।

সজীব সবুজ প্রায় শিকড়হীন য়্যাজোলা মুরগী ছানারও অতি প্রিয় খাদ্য। ধানের চারা রোপন করবার 8—10 দিন আগে মাটিতে য়্যাজোলা মিশিয়ে দিলে তা পচে চমৎকার সার হয়। ধানের জমিতে বা অন্য জলা জমিতে য়্যাজোলা ব্যাপক ভাবেই জন্মায়। প্রকৃতির এই সম্পদটির ব্যাপক চাষ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পর্যন্তও কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি।

এই গ্রন্থে য়্যাজোলার চাষ, তার কীটশত্রু, ছত্রাক রোগ, ও নীলাভ-সবুজ শৈবাল, কচুরীপানা, স্যালভিনিয়া, টোপাপানা, ক্ষুদেপানা, প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণ আছে, যা কৃষির স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ ও শিক্ষকদের কাজে লাগবে। গ্রন্থকারদ্বয় অনেক পরিশ্রম করে জলজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে যেসব গবেষণার ফল এতে লিপিবদ্ধ করেছেন তা প্রশংসনীয়। লেখকদিগকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়,
অধ্যাপক, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
মোহনপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

ভূমিকা

খাদ্যের নিয়মিত সরবরাহের প্রয়োজনে কৃষিকর্ম মানুষের অন্যতম আদিম পেশা। খাদ্যোৎপাদনে প্রকৃতির উপর পূর্ণ নির্ভরতার ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভব। সর্বাধুনিক উত্তরণ বৈজ্ঞানিক অন্বেষনের বহুব্যাপ্ত জ্ঞানলব্ধ জৈব পরিমণ্ডলে পরস্পর নির্ভরশীলতার সুশৃঙ্খল ছন্দের আবিষ্কার। তাৎক্ষণিক লাভের লোভে প্রযুক্তিবিদ্যার যথেচ্ছ ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত বিপদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও সচেতন হওয়ার ফলে সক্রিয় প্রচেষ্টায় বাস্তরীতির বিচ্যুতিগুলির সংশোধনে মানুষ আজকাল অনেক তৎপর। তাই বাস্তরীতির সামূহিক অধ্যয়নে বিজ্ঞানীমহল সবিশেষ আগ্রহী, প্রতিনিয়ত অনুসন্ধানী দৃষ্টি চতুর্দিকে নিবদ্ধ কিভাবে মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম বাস্তরীতিকে অর্থাৎ কৃষিপরিমণ্ডলকে স্বাভাবিকতার সন্নিকটবর্তী করা যায়। অনুসন্ধিৎসার ফল হিসাবে অনেক তথ্য আহৃত হয়েছে। প্রকৃতির বাস্তরীতির বহমান নিয়মে আবদ্ধ মানুষ ভারসাম্যের একটি সক্রিয় অংশ। প্রকৃতি খাদ্যশৃঙ্খলই তার পুষ্টির সূত্র—পূর্ণচক্রের স্বাভাবিক আবর্তন নিরন্তর চলছে। এই প্রবাহে মানুষের দেয় শোধ করতে হ'বে স্বাভাবিক নিয়মে। সেই কারনে সূর্যের আপতিত শক্তির বন্ধনকারী উদ্ভিজ্জের অথবা বাস্তব্যতত্ত্বীয় ভাষায় উৎপাদকের (Producer) উপাদানকে পরিমিত ব্যবহার করার নতুন শিক্ষা নিতে হয়েছে মানুষ তথা গ্রাহককে (consumer)। এই সাথে মনে রাখতে হয়েছে অনুজীবকে (Micro-organism) পাচক (decomposer) হিসাবে।

মানুষের বিশৃঙ্খল ক্রিয়াকাণ্ড পরিবেশের স্বাভাবিক ছন্দের পতন ঘটিয়ে বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিত্রাণ পথ খুঁজেছে ব্যাকুল হ'য়ে। মানুষের উদ্ভাবনীশক্তিই তার সমাধান পথ খুলে দিচ্ছে। কৃষির ভিত্তি মাটীতে আপাতঃ লাভের আশায় কৃত্রিম অজৈব রাসায়নিক সারের যথেচ্ছ প্রয়োগের বিরূপ ফল অনুধাবন ক'রে এখন আবার প্রাকৃতিক জৈব সারের ব্যবহারের কথা শুধু ভাবছেই না। উন্নতিশীল সভ্যযুক্ত দেশগুলিতে তাদের আদি প্রচলিত জৈব উপাদান সার হিসাবে ব্যবহারের আশানুরূপ ফললাভের শিক্ষা অন্যান্য উন্নতিশীল

দেশগুলিতে যথা ভারতবর্ষের মাটীতে প্রয়োগে যত্নবান করেছে। ভিয়েতনামের কৃষিব্যবস্থাপনা প্রমাণ করেছে জলজ আগাছার অনভিপ্রেত দিকগুলি তাদের উপকারী ভূমিকাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই আবিষ্কার একদিকে যেমন পরিবেশে কৃত্রিমতা অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পরিমণ্ডলীর বিশৃঙ্খলতার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে তেমনই আর্থনীতিক সাশ্রয় এনে সামাজিক পটভূমির পরিবর্তন আনতে সাহায্য করছে। ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার পরনির্ভরশীলতা কমাবার দিকে দৃষ্টি রেখে ও পরিবেশের এবং আর্থ-সামাজিক সম্পর্কে নবচেতনা সৃষ্টির প্রয়াসে কৃষিজমিতে তথাকথিত জল আগাছার ব্যবহারিক দিক যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্য সমর্থিত করে পরিবেশন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে। বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে উন্মুক্ত ভাণ্ডার হিসাবে বিবেচনা করে বিভিন্ন বিজ্ঞানপত্র ও পুস্তকে নিবদ্ধ তথ্য আহরণ করে এই পুস্তিকা রচিত এবং তার সমর্থনে সংযোজিত হয়েছে নিজস্ব পরীক্ষায় প্রত্যয়িত তথ্য ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। অনেক আহৃত তথ্যের সূত্রোল্লেখ না থাকলেও সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অবশ্য করণীয়।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় [পি. এইচ্-ডি. (রিডিং, ইংল্যাণ্ড) এবং ফেলো, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ এগ্রোনমি] প্রফেসর, শস্যবিজ্ঞান বিভাগ এবং প্রাক্তন ডীন, কৃষি ফ্যাকাল্টি ও প্রাক্তন উপাচার্য, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে পাণ্ডুলিপি পড়ে একটি সুন্দর মুখবন্ধ লিখে গ্রন্থকারদ্বয়কে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন।

পাণ্ডুলিপি অনুলিখনের জন্য গ্রন্থকারদ্বয় তাদের প্রিয় ছাত্র শ্রীউজ্জ্বল বরণ প্রধান, রিসার্চ স্কলার, শস্যবিজ্ঞান বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এর কাছে কৃতজ্ঞ। বইটি ছাপানোর সময় প্রুফ সংশোধনে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা রায়, এম. এ. (বাংলা,) বি. টি., বি-2/65, কল্যাণী, নদীয়া; শ্রীমতী শিখা মণ্ডল, বি. এ., বি-2/134, কল্যাণী, নদীয়া, ও অন্যতম প্রিয় ছাত্র শ্রীঅভিজিত সাহা, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, শস্যবিজ্ঞান বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থকারদ্বয় এদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
মোহনপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ,

বিজন কুমার মণ্ডল
মনোজ রঞ্জন ঘোষ

সূচীপত্র

ভাসমান জলজ উদ্ভিদ

প্রথম অধ্যায়

॥ সূচনা ॥

প্রস্তর যুগে অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার বছর আগে মানুষ যখন কৃষিকাজ আর পশুপালন শিখল তখনই শুরু হ'ল প্রকৃতির সাথে মানুষের এক নতুন সম্পর্ক। মানুষ আর প্রকৃতির কর্মকাণ্ডের দাস থাকল না, প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সচেষ্ট হ'ল। মানুষের এই 'কর্ষণ ক্রিয়াশীলতা' বা যাকে বলা হয় "Man's cultivating activity" তা' হ'ল এক নিয়মিত ও অপরিবর্তনীয় পদ্ধতি। নিজের প্রয়োজন মেটাতে মানুষ বিরামহীনভাবে দুই প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ—উদ্ভিদ ও পশুর ব্যবহার করতে থাকল প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে প্রাপ্ত নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিতে যতই উন্নত হোক্ না কেন, সে পৃথিবীর জৈব মণ্ডলের (Biosphere) বহুধা-বিভক্ত ও অত্যন্ত জটিল শৃঙ্খলের একটি অংশ মাত্র। কাজেই মানুষ আর প্রকৃতির কর্মকাণ্ডে ঐকতান থাকলে, প্রকৃতির নিয়মকে সঠিকভাবে বুঝে তা'র সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণ করলেই সর্বাপেক্ষা লাভজনক হয় তার "কর্ষণ ক্রিয়াশীলতা"। তা' অনুধাবন না করলে বহুবিধ সমস্যার দিকে মানুষ নিজেকে নিয়ে যাবে।

মানুষের প্রাচীন ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমে পরিবর্তিত হ'ল অর্থ নৈতিক কর্মকাণ্ডে। কৃষিকর্ম শুধু খাদ্যের ও আবাসের প্রয়োজন মিটিয়ে ক্ষান্ত থাকল না, তা' শিল্পকর্মে কাঁচামাল সরবরাহের ভিত্তি হয়ে উঠল সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে। সেই কারণে পরিবেশে আনতে হ'ল অনেক পরিবর্তন, অনুপ্রবেশ ঘটল কৃত্রিমতার। কৃষিকর্মের উন্নয়নের সঙ্গ হিসাবে সৃষ্টি হ'ল মানুষের সচেষ্ট উপায়ে পরিবর্তিত বাস্তুরীতির (ecosystem) যা' বর্তমানে 'কৃষি পরিমণ্ডল' (Agro-ecosystem) নামে অভিহিত। কৃষিকর্ম দ্বারা মানুষের প্রয়োজনীয় আহরণ মূলতঃ বাস্তব্যতন্ত্রীয় সম্পর্কের এবং প্রকৃতির খাদ্যশৃঙ্খলের ব্যবহার। আধুনিক কালের অবস্থায় এই খাদ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান সজ্জিত করলে যে পিরামিডের সৃষ্টি হ'বে তা'র শীর্ষে অবস্থান করছে মানুষ। ভিত্তির সুবৃহৎ বিস্তার ক্রমশঃ সংকীর্ণ হ'তে থাকে ও তাদের অবস্থান

এমনই পরস্পর নির্ভরশীল যে কোথাও কোনও বিচ্যুতির উপায় নেই, কারণ এই পিরামিডের সুস্থিতি নষ্ট হ'লে শীর্ষে অবস্থানকারীর পতন বা বিপর্যয় তা'তে অবশ্যম্ভাবী। মানুষের খাদ্য আহৃত হয় প্রধানতঃ দুই ভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল থেকে—একটির আবর্তন চলে মাটির উপর নির্ভর করে আর অপরটির সমুদ্রের জলমণ্ডলে। তবে শেষোক্ত শৃঙ্খলে মানুষের নির্ভরতা তুলনামূলকভাবে খুবই সামান্য। যাই হোক্, পৃথিবীর মানুষের সঠিক ও পর্যাপ্ত পুষ্টি আহরণ করতে হ'লে এই দ্বৈত খাদ্যশৃঙ্খল থেকে তা' সংগ্রহ করতে হ'বে তাদের স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে ও তার উন্নতি করে। মনুষ্য-সৃষ্ট বাস্তরীতিও মূলতঃ পরিচালিত হয় প্রাকৃতিক নীতি অনুসরণ করে, তবে অধুনা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রযুক্তির প্রয়োগ একটি নতুন সংযোজন। একদিকে তাই মানুষ যেমন প্রাকৃতিক জৈব উপাদান থেকে তার খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করছে তেমনই অপর দিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে প্রাকৃতিক জৈব উপাদান উৎপাদনের পরিমাণকে বাড়াতে সচেষ্ট হচ্ছে। আশু প্রয়োজন মেটাতে ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক সম্পর্কের মৌলিক পার্থক্যের দরুণ সারা পৃথিবীর মানুষের কর্ষণ ক্রিয়াকাণ্ডের বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকৃতির জৈব উপাদান উৎপাদন ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে ও পূর্বাপর চিন্তা না করে বাস্তরীতির চলন ব্যবস্থার স্বাভাবিকতা বিনষ্ট করে অধিকতর জৈব উপাদানের (biomass) আবাদ তোলা হয়েছে। এই অবিমৃষ্যকারিতা আর্থসামাজিক চরিত্রের মধ্যেই বিরাজ করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে বাস্তব্যতন্ত্রীয় ভারসাম্য নির্ভর করে প্রকৃতিতে উদ্ভিদ জৈব উপাদান, প্রাণী জৈব উপাদান ও জীবাণু (micro organism) জৈব উপাদানের পরিমাণের পারস্পরিক প্রয়োজন-ভিত্তিক সমতার উপরে। এই প্রসঙ্গে বাস্তব্যতন্ত্রীয় মূল কথাগুলি স্মরণ করা প্রয়োজন।—উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ জৈব উপাদান (phytomass) সূর্যের বিকীর্ণ শক্তি (radiant energy) গ্রহণ করে। সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে মাটির অজৈব রসায়ন ও বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণ পদ্ধতিতে জৈব পদার্থে পরিণত করে ও বাতাসের অক্সিজেন সমৃদ্ধ করে। প্রাণী জৈব উপাদান (প্রাণীকুল—zoomass) উদ্ভিদকুল থেকে আহার্য সংগ্রহ ও বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করে, পরিবর্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্জন করে শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে। উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের উৎপন্ন পদার্থ, তাদের দেহাবশেষ জীবাণুকুলের আবাস ও আহার এবং জীবাণু তার জীবনক্রিয়ার সূত্রে এই প্রাণী ও উদ্ভিদ উপাদান পরিবর্তিত করে মাটিতে অজৈব বা খনিজ রসায়ন

হিসাবে ফিরিয়ে দেয়। এই আবদ্ধ চক্রের ক্রিয়াশীলতা বজায় রাখতে প্রয়োজন বাস্তরীতিতে উদ্ভিদকুল, প্রাণীকুল ও অণুজীবকুলের মধ্যে সঠিক ভারসাম্যের অর্থাৎ এই তিনটি অংশের নিয়মিত অনুপাত রক্ষা করার। এই পূর্ণ বাস্তরীতিতেই ও তার ভারসাম্য, অনুপাত ও আবর্তের নিয়মের সাথেই মানুষের জীবন ও তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কযুক্ত। বাস্তরীতির তিনটি প্রধান জৈব অংশের (biotic component) ক্রিয়াকলাপ কেবল জীবন নির্ভর নয়। তা' আবার নিরূপিত হয় বহুধা-বিভক্ত অজৈব অংশের (Abiotic Component) সঠিক ও সমানুপাতিক সরবরাহের উপর। কিন্তু বাস্তরীতির অজৈব অংশ, সূর্যের বিকীর্ণ শক্তি ছাড়া, পৃথিবীতে সঞ্চিত খনিজ ও জল পরিমাণগতভাবে সীমিত। মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে এই সীমিত পদার্থগুলির ব্যবহারও সেই কারণে আবহমানকাল চলতে পারে না। বাস্তরীতির খাদ্য-শৃঙ্খলে এই ধরনের আবর্তন-যোগ্যতারহিত পদার্থের ব্যবহার স্বাভাবিক গতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়, কৃত্রিম চেষ্টায় অমিত বা যথেচ্ছ ব্যবহার করা সমীচীন নয়। কারণ এগুলি আবর্তনশীল না হওয়ায় অচিরেই নিঃশেষিত হবে ও বাস্তরীতিতে বিপর্যয় ঘটবে। বিপর্যয় কেবল কতকগুলি ব্যবহৃত পদার্থের আবর্তনহীনতার জন্যই হবে না, তা'র পূর্বে সঠিক ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার-বিধির অভাবে তা' ক্রমাগত পরিবেশ দূষণ দ্বারা বাস্তর বসবাসযোগ্যতা কমিয়ে আনবে, জীবের জীবনে আসবে নানা অশ্রুতপূর্ব ব্যাধি ও বৈকল্য। এই ধরনের পদার্থের ব্যবহার পরবর্তী পর্যায়ের বর্জ্য হিসাবে পরিত্যক্ত হলে তা' আবার বাস্তর পরিসরে সংকোচন আনবে। কৃষি বাস্তরীতিতে বা পরিমণ্ডলে এই ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আধুনিক সচেতন বিশ্লেষণে ধরা পড়তে শুরু করেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আহার ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে চাপ পড়ছে সবচেয়ে বেশী এই কৃষি বাস্তরীতিতে, কারণ উৎপাদন বৃদ্ধিই এই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। অধিক ফলনশীল জাতের উদ্ভাবন, কর্ষণ প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিকতা আনয়ন, জমির পৌনঃপুণিক ব্যবহার দ্রুত-ক্ষয়িত উর্বরা শক্তির পরিপূরণে সংশ্লেষিত অজৈব রসায়নের বহুল ব্যবহার কৃষি পরিমণ্ডলে দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন আনয়ন করেছে। অজৈব রাসায়নিক সারের প্রয়োগের ফল হিসাবে মাটির নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস্ চক্রে বিঘ্ন হয়েছে আর এর অন্তঃফল হল জীবনের উপর বিরূপ ক্রিয়া। মাত্রাতিরিক্ত নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস্ সার মাটিতে প্রয়োগ করা মাটির হিউমাসের (Humus) পক্ষে ক্ষতিকর। লক্ষ লক্ষ বর্ষের প্রাকৃতিক নিয়মে যে মাটি

সৃষ্টি হয়েছে মনুষ্যকৃত এই সব রাসায়নিক পদার্থের (সারের) বিবেচনাহীন প্রয়োগের ফলে মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন ধরনের জীব ও অণুজীবের উপর বিষম ক্রিয়ার ফলে মাটির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হ'বে ও তার স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা সমূহভাবে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনায় উপস্থিত হ'বে। কৃষি বাস্তরীতির ভিত্তিভূমি 'মাটির স্বাভাবিকতা আনয়ন' (Soil amelioration) সম্পর্কে ভাবনা চিন্তায় তাই কেবল মাটির ভৌত, রাসায়নিক এবং জলীয় অবস্থার কথাই সীমাবদ্ধ নয়, তার পরিসীমায় জৈব ক্রিয়াকলাপ ও মাটির জীবজগৎও অন্তর্গত। সভ্যতার উষাকালে যে মানব সমাজ প্রাকৃতিক সম্পদের উৎসকেই কর্ষণক্রিয়াশীলতায় সীমাবদ্ধ রেখেছিল আদিম সরল পদ্ধতির মাধ্যমে আজ তা'র আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কর্ষণক্রিয়ায় এখন মানুষ কেবল প্রকৃতির করুণার উপর নির্ভরশীল নয়, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা তাকে নতুন পথে পরিচালিত করেছে প্রয়োজনের চাপে। আদিম অভ্যাসে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। পরিবেশ সচেতনতা মানুষকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে প্রযুক্তির সংহত ব্যবহার। বহুবিদ্যার সমাহারে গঠিত বাস্তব্যতত্ত্বীয় জ্ঞান ও তার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ, চলমান বাস্তরীতিতে, জীবজগতের খাদ্যশৃঙ্খলে সঠিকভাবে আরোপ করে, বাস্তরীতির ভারসাম্যে কোনও বিচ্যুতি না ঘটিয়ে আকাঙ্খিত উৎপাদন লাভের পন্থা নির্ণয় করায় সততঃ সচেষ্ট হ'তে।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের সমারোহ, প্রাকৃতিক সুযোগ সৃষ্টি করেছে সূর্যের বিকীর্ণ শক্তির সদ্ব্যবহারের। মৌসুমী আবহাওয়া অঞ্চলে জলের প্রাচুর্য ও বারিপুষ্ট (Rainfed) অবস্থায় চাষ-আবাদ অনেক সমস্যা সৃষ্টির সাথে তা'র সমাধানের ইঙ্গিত মানুষের কাছে আজ আর অজানা নয়। চাষের মাটির স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে প্রাকৃতিক সূত্রের সদ্ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ, অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অনেকাংশে জ্ঞাত। আগাছামুক্ত চাষ-আবাদে মাটি থেকে ফসলের পুষ্টি আহরণ প্রায় পূর্ণমাত্রায় হ'তে পারে কারণ আগাছা তা'র অংশভাগ হ'তে পারেনা আগাছা দমনের ফলে। জলাশয়, পয়ঃপ্রণালী, আবদ্ধ-জলার চাষের জমিতে (ধান জমিতে) বিভিন্ন ধরনের ভাসমান আগাছা অনেক ক্ষেত্রেই চাষ আবাদের অসুবিধা সৃষ্টি করে, জলাশয়ের জল দূষিত করে ও পয়ঃপ্রণালীর জলবহন ক্ষমতা প্রতিহত করে। এই সমস্ত কারণে ভাসমান জলজ উদ্ভিদ বিভিন্ন অবস্থানে অনভিপ্রেত আগাছা বলেই বিবেচিত হয় ও এতাবৎকাল পর্যন্ত সেগুলি দমনের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে বা করার

চেষ্টা হয়েছে। বিগত কয়েক দশকের বৈজ্ঞানিক বিচার ও অন্বেষণ এই সব আগাছার বাস্তব্যতন্ত্রীয় প্রয়োজনীয়তার দিকটিও উন্মোচন করেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে এই সব আগাছার বেশ কিছু প্রজাতি পরিবেশ শোধনের ভূমিকা পালন করে, খাদ্যশৃঙ্খলে উপযোগী কর্তব্য পালন করে বা বাতাসে মুক্ত নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় মাটির নাইট্রোজেন চক্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কাজেই এইসব আগাছা চাষের জমিতে বাঞ্ছিত হতে পারে তাদের জীবনচক্রের সঠিক অনুসরণ ও নির্দিষ্ট পর্যায়ে সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। কচুরীপানার শিকড়ের জলস্থিত ভারী ধাতু মুক্ত করার ক্ষমতা সুপরিজ্ঞাত তাই তা' আজকাল 'জৈব পরিস্রাবক' (biological filter) নামে অভিহিত। ক্ষুদে পানা হাঁসের অন্যতম প্রিয় খাদ্য, ফলে গ্রামীণ বা কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে এর ভূমিকা স্বীকার করতে হয়। বিভিন্ন শৈবাল ও তাদের নিকটাত্মীয় ফার্ণ জাতীয় জলজ উদ্ভিদ 'য়্যাজোলা'র বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ ক্ষমতার বিষয়টিও কৃষিবিজ্ঞানে বেশ আগ্রহের সঞ্চার করেছে। একদিকে পরিবেশ সচেতনতা, অন্যদিকে খনিজ উপাদানের সীমিত পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ায় এই সব এক-কালের অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ এখন অবশ্য ব্যবহার্য সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হতে চলেছে।

ভারতবর্ষ তথা এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে ধান বা চালই প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত এবং সম্ভবতঃ ভূমণ্ডলের এই অংশেই ধানচাষের সূচনা হয় প্রথম। ন্যূনাধিক চার কোটি হেক্টর জমিতে ধানচাষ হয় বলে এই ফসলের চাষে ভারতবর্ষ শীর্ষস্থানীয়, কিন্তু প্রতি হেক্টরে 2,049 কেজি ধান উৎপাদনে ভারতবর্ষ কম উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। বৈপরীত্যপূর্ণ ভারতবর্ষের এও এক বৈপরীত্য। সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যার সাথে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণের অনাকাঙ্খিত অসমতা সুবিদিত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির অসম প্রতিযোগিতা সমস্যার জটিলতাকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে চলেছে। এই সমস্যার সমাধানে তৎপর কৃষিবিজ্ঞানীরা কিছু আশার আলো দিয়েছেন ও উৎপাদন বৃদ্ধির হার আরও বাড়ানোর জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন।

ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এই কম উৎপাদনশীলতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আবহমান কাল ধরে চিরাচরিত পদ্ধতিতে ধান চাষ, জমিতে যথাযথ ভাবে সার প্রয়োগে সাধারণ চাষীদের অক্ষমতা ও অনীহা জমির

উর্বরতাকে ক্রমাগত কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বাড়ানোর একটি উপায় হ'ল কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানো এবং তার সহজতম উপায় হ'ল বনভূমি সংকোচন করা। কিন্তু বনভূমির অভিপ্রেত অনুপাত হ'ল মোট জমির 33% যা' এখনই আমাদের দেশে 20%-এর নীচে নেমে গিয়ে নানাবিধ পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করছে। কাজেই বনভূমি সংকোচন আর সম্ভব নয় এবং তা বৃদ্ধি করাই অভিপ্রেত। কাজেই উৎপাদন বৃদ্ধির আর কি কি বিকল্প উপায় হ'তে পারে?—বেশ কয়েকটি উপায়ের সমন্বিত পদ্ধতিতে তা' সম্ভব। সেগুলি হ'ল :—চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তন করে বিজ্ঞানানুগভাবে বিশ্লেষণী মন নিয়ে চাষ করা, অধিক ফলনক্ষম জাতের শস্যের চাষ, এক ফসলী জমিকে বহু ফসলী জমিতে পরিণত করা, উর্বরতা রক্ষা করা বা বাড়াবার জন্য সুষমভাবে সার প্রয়োগ করা। বর্তমানের গড় দানাশস্যের হেক্টর প্রতি 1·5 টন গড় উৎপাদনকে বাড়িয়ে অবিলম্বেই 2·4 টনে করতে না পারলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে সঙ্গতি রাখা সম্ভব নয়। হিসাবে প্রাপ্ত সূত্র থেকে জানা যায় এই বর্ধিত উৎপাদন পেতে হ'লে উন্নতিকামী দেশগুলিকে তাদের হেক্টর প্রতি 25 কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের বর্তমান হারকে বাড়াতে হবে 75 কেজিতে অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ বাড়াতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের এই সরাসরি সম্পর্কের কথা আমাদের দেশের চাষীদের কাছে আজ আর অজানা নেই। পুরুষানুক্রমে আমাদের দেশের কেন, সব দেশের চাষীরা তাদের অভিজ্ঞতার থেকে বুঝেছিলেন শস্যের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে জমির উর্বরতার উপর। তাই তাঁরা এককালে স্থান পরিবর্তন করতেন অনাবাদী জমির সন্ধানে, আরো পরবর্তীকালে স্থায়ী সামাজিক জীবনের শুরু হ'বার পর থেকেই সম্ভবতঃ জমিতে সার প্রয়োগ করে জমির উৎপাদিকা শক্তিকে বাড়াতেন বা কমে যাওয়া উর্বরতাকে বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। সেকালের সেই সব সার ছিল পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে তৈরী, যা কিছুদিন আগের বহুল ব্যবহৃত রূপ হিসাবে দেখতে পাই গোবর ও খামারের / গৃহস্থালীর আবর্জনা পচানো সার। ইদানীংকালে, বিশেষ করে উত্তর স্বাধীনতা কালের মধ্যেই, নানা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি কারণে, এই পচনশীল ও বর্জনীয় জৈব পদার্থ উদ্ভূত সারের ব্যবহারও কমতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধির আশু উপায় হিসাবে পাশ্চাত্য প্রযুক্তি বিদ্যার অনুকরণে, অনুশীলন ও উপযোগিতার মূল্যায়ন ছাড়াই এবং

সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা না করেই, যৌগ কৃত্রিম রাসায়নিক সারের ব্যবহার করাকে জনপ্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করা হয়। চাষীদের কাছেই তাৎক্ষণিক উৎসাহজনক ফললাভের উদাহরণ ও অনায়াসলব্ধ এই কৃত্রিম সারের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এই ভাবে খাদ্যোৎপাদন সমস্যা আর এক জটিলতায় আবদ্ধ হয়ে পড়তে থাকে। এই নতুন জটিলতার মাত্র কয়েকটি হ'ল—কৃত্রিম সারের সুষম ব্যবহার না করায় মাটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে তার স্বাভাবিক উর্বরতা বিঘ্নিত হওয়া এবং এই সারের মূল উপাদানের জন্য বিদেশের উপর বহুল পরিমাণ নির্ভরশীলতা, আকরিক এই উপাদানের অর্থাৎ পেট্রোলিয়ামজাত ন্যাপথার ক্রম দুষ্প্রাপ্যতা ও পরিশেষে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে বিশ্বব্যাপী মন্দা, পেট্রোলিয়াম লব্ধ শক্তি নিয়ে নানা সমস্যা উন্নতিকামী দেশগুলির খাদ্যোৎপাদনকে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত করেছে।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা বজায় রাখার উপায়ের অন্বেষণ রাসায়নিক সারের পূর্ণ বিকল্প আনয়ন না করে বর্তমানে এর ব্যবহারকে সীমিত করায় সহজ জীবজ সারের সন্ধান দিয়েছে। এই জীবজ সার, বিশেষ করে নাইট্রোজেন প্রদায়ী সার হিসাবে, বেশ কয়েকটি ধান জমির সহজাত উদ্ভিদের কথা বিবেচনা করা হবে। এই উদ্ভিদগুলি শ্রেণীবিন্যাস-বিজ্ঞানগতভাবে পরস্পরের সাথে প্রায় সম্পর্কহীন, কিন্তু জীবনধারণের বা জীবনধারা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বিজ্ঞানের অন্বেষণ কতকগুলি মৌলিক তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করেছে—তার মধ্যে একটি হল পদার্থের অবিনশ্বরতা আর পদার্থনির্ভর জীবের পরস্পর নির্ভরশীলতা। জীব, বিশেষ ভাবে প্রাণীর শরীর গঠনে আমিষঘটিত উপাদানের প্রাধান্য থাকে তা' আহৃত হয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর থেকেই অথবা মূলতঃ উদ্ভিদ থেকে, কারণ উদ্ভিদই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান সংশ্লেষণ করে শক্তিকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে পারে। পদার্থ অবিনশ্বর হ'লেও তা' সাধারণভাবে রূপান্তরপ্রবণ। এই রূপান্তর জৈব চক্রেও অন্তর্ভুক্ত হয়। তেমনই একটি চক্র হ'ল নাইট্রোজেন চক্র। বাতাসের নাইট্রোজেন, গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে এবং অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে তার অনুপাত বহুকাল ধরে' প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে সামগ্রিকভাবে। এই সমান অনুপাত বজায় থাকা সম্ভব হয়েছে এই নাইট্রোজেন চক্রের অনুবর্তনের দ্বারা। এই অনুবর্তনের অংশীদার হ'ল জীব, সেকথা পূর্বেই

বলা হয়েছে। এই তথ্যকেই মূল ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা সম্ভবতঃ উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে নাইট্রোজেন ব্যবহারের প্রাকৃতিক চক্রটির আংশিক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। কৃত্রিম রাসায়নিক সারের উপর পূর্ণ-নির্ভরতা কমানোর জন্য প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন সদ্ব্যবহারের স্বাভাবিক নিয়মটিকে নিজের অনুকূলে ব্যবহারের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। ধানের জমিতে সহজাত হিসাবে নীলচে-সবুজ শ্যাওলার নাইট্রোজেন নিবদ্ধকারী ক্ষমতার কথা আজ আর অবিদিত নয়। নষ্টক-য়্যানাবিনা (*Nostoc-Anabaena*) দলের এককোষী উদ্ভিদের সঙ্গে লাইকেন্ (Lichen) নামক যৌগ উদ্ভিদের, ব্রায়োফাইটার (*Ricch*, *Blasia cavicularia*, *Anthoceros*) বিভিন্ন গণভুক্ত প্রজাতির, টেরিডো-ফাইটা বা ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদের (Azolla), গুপ্তবীজি (Gymnospermae) উদ্ভিদের বিভিন্ন গণভুক্ত প্রজাতি (*Cycas*, Stangeria, *Encephalartos*) ও ব্যক্তবীজী (Angiospermae) উদ্ভিদের বিভিন্ন গণের (Genus) সহিত মিথোজীবিতার দ্বারা নাইট্রোজেন প্রদান ও খাদ্য আহরণের বিষয় জানা গেছে। এইগুলির মধ্যে *Azolla-Anabaena*-র মিথোজীবিতার দ্বারা ধান জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের সংযোগের বিষয়টি অধুনাকালে অনেক আকর্ষণীয় বিষয়। *Azolla-Anabaena*-র এই সম্পর্ক একদিকে যেমন জীবজ নাইট্রোজেন সারের উৎস, তেমনই সৌরশক্তির আবদ্ধ করণের দ্বারা মাটির জৈব উর্বরতা বৃদ্ধির দিকটিও উল্লেখযোগ্য। আধুনিককালে সালোক-সংশ্লেষকারী নাইট্রোজেন প্রদায়ী জীবজ সারের প্রতি এই কারণেই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখব অনুরূপ অন্যান্য উচ্চপর্যায়ভুক্ত আপাতঃ অনভিপ্রেত উদ্ভিদের ব্যবহার দ্বারা ধান জমির স্বাভাবিকতা বজায় রাখা ও উর্বরতা বৃদ্ধি করা কেমন ভাবে সম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

য়্যাজোলা

সূর্যকিরণের শক্তিকে ব্যবহারোপযোগী করা ও বাতাসের নাইট্রোজেনকে শস্যোৎপাদনে ব্যবহার করার স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে কাজে লাগাবার জন্য অধুনা সালোক-সংশ্লেষী উদ্ভিজ্জ সারের প্রয়োগের বিষয়টি সারা বিশ্বে বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ আগ্রহের ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। একাধারে সৌরশক্তি আবদ্ধকরণ ও বায়বীয় নাইট্রোজেনের কৃষিক্ষেত্রে সদ্ব্যবহারের জন্য 'য়্যাজোলা-অ্যানাবিনা'র মিথোজীবিতা ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করছে। কারণ ধান জমির জলপূর্ণ অবস্থায় এর বৃদ্ধি যেমন স্বাভাবিক ও দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় তেমনই এর দ্রুতপচনশীলতা ও নাইট্রোজেন সংযোগের দ্রুততাও লক্ষ্যণীয় গুণ। এছাড়াও য়্যাজোলার বিস্তার অন্যান্য আগাছার পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে কৃষি অর্থনীতির পক্ষে সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

বর্তমানে এই ভাসমান ফার্ণ (ঢেঁকিশাক) বিভাগের উদ্ভিদ, য়্যাজোলা (*Azolla Lam*) উষ্ণ ও শীতল জলবায়ু অঞ্চলের দেশগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় এবং চীন, জাপান, ভিয়েতনাম ইত্যাদি পূর্ব-এশীয় দেশগুলির ধান চাষে এই জীবজ নাইট্রোজেন সারটির ব্যবহার বহুল পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করায় ভারতবর্ষেও তা'কে আমদানী করে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। কিন্তু অধিক উষ্ণতা ও শুষ্ক পরিবেশ অসহনীয় এই উদ্ভিদটির আদি আবাস কোথায় ?—মানুষের প্রত্যক্ষ চেষ্টায় এর বিস্তার বহুব্যাপ্ত হ'লেও য়্যাজোলার কয়েকটি প্রজাতির স্বাভাবিক বাসভূমির কিছু হদিশ পাওয়া যায় : যেমন—**ক্যারোলিনিয়ানা, ফিলিকুলয়ডিস্, মাইক্রোফাইলা, মেক্সিকানা, নিলোটিকা, পিন্নাটা, ইম্ব্রিকাটা ও জ্যাপোনিকা** নামক **য়্যাজোলা** প্রজাতিগুলিকে (*A. caroliniana, A. filiculoides, A. microphylla, A. mexicana, A. nilotica, A. pinnata, A. imbricata* ও *A. japonica*) সাধারণভাবে ধরা হয় যথাক্রমে পূর্ব-উত্তর আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের

আমেরিকার নিরক্ষীয় ও উপনিরক্ষীয় অঞ্চলের, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর থেকে উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের, নীল নদের উত্তর অববাহিকা থেকে সুদান অঞ্চলের, অধিকাংশ এশীয় ভূমি থেকে আফ্রিকার নিরক্ষীয় সমুদ্রোপকূল সমীপবর্তী স্থান সমূহে ও শেষ দু'টি প্রজাতি জাপানের আদি অধিবাসী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য জাপানে প্রাপ্ত দু'টি প্রজাতির প্রথমোক্তটিকে পিন্নাটার ও শেষোক্তটিকে ফিলিকুলয়ডিস্ প্রজাতির সমনামী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ভারতবর্ষে **য়্যাজোলা পিন্নাটা** প্রজাতিকে সবিশেষভাবে পাওয়া যায় এবং এদের স্বাভাবিক বাস্ত হ'ল কৃষি পয়ঃপ্রণালী, পুষ্করিণী ও নদীর স্থির জলাঞ্চল।

য়্যাজোলা (*Azolla Lam.*) নামক গণটি ফার্ণ বা টেরিডোফাইটা (Pterydophyta) বিভাগের স্যালভিনিয়েসী (Salviniaceae) গোষ্ঠীভুক্ত জলজ উদ্ভিদ। এই গোষ্ঠীতে পূর্বোল্লিখিত ছয়টি প্রজাতি যথা **ক্যারোলিনিয়ানা, ফিলিকুলয়ডিস্, মেক্সিকানা, মাইক্রোফাইলা, নিলোটিকা,** ও **পিন্নাটা** বর্তমান। এদের মধ্যে প্রথম চারটি প্রজাতি আবার **এনাজোলা** (*Enazolla*) নামক উপগণভুক্ত ও পরের দু'টি **রাইজোস্পার্মা** (*Rhizosperma*) নামক উপগণভুক্ত। ভারতবর্ষে **য়্যাজোলা পিন্নাটা** প্রজাতিটিকে সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

এই **য়্যাজোলা পিন্নাটার** বৈশিষ্ট্য হ'ল এর সঙ্গে সায়ানোফাইসী (Cyanophyceae) গোষ্ঠীর অন্তর্গত নীলচে-সবুজ শ্যাওলার (Blue-green algae) সহাবস্থিতি বা মিথোজীবিতা। শেষোক্ত উদ্ভিদটি বায়বীয় নাইট্রোজেন আহরণ করে **য়্যাজোলার** পাতার নীচের দিকের স্টোমাটা (Stomata) ছিদ্রের নিকটবর্তী শ্লেষ্মাঞ্চলে জমা করে। এই নাইট্রোজেন যৌগই **য়্যাজোলা** খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ফার্ন-শ্যাওলার এই যুগ্মজীবন পূর্বোল্লেখিত সৌরশক্তি ও নাইট্রোজেন সার হিসাবে ব্যবহারের এক অদ্বিতীয় সুযোগের ক্ষেত্র কৃষিবিজ্ঞানীদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বিশেষ করে ভিয়েতনাম ও থাইল্যাণ্ডে এই যুগ্ম-উদ্ভিদকে ধান চাষে সার হিসাবে ব্যবহারের কিছু কার্যকরী অভিজ্ঞতা ও তাদের প্রয়োগের বিষয়টি বেশ লক্ষণীয়। মুর (Moore, 1969), ট্র্যান্ ও ডাও (Tran and Dao, 1973) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের দ্বারা আহৃত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ধান চাষের পর জমির জীরেন সময়ে **য়্যাজোলার** আবাদের ফলে অন্য সার

প্রয়োগ না করেও হেক্টর প্রতি 5-6 টন ধান উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু, সামগ্রিকভাবে **য়্যাজোলার** বিষয়ে আনুপূর্বিক বা বিশদ তথ্য না শীত প্রধান দেশগুলিতে ও উষ্ণাঞ্চলীয় দেশগুলি থেকে পাওয়া যায়। কেবল মুরে'র (Moore, 1969) প্রাথমিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে **য়্যাজোলা** চাষে 14—40% ধান্যোৎপাদন বাড়ানো যায়।

এই প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতেই সম্ভবতঃ জীবজ সার হিসাবে ধান চাষে য়্যাজোলার সংযোগ থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে প্রচলিত হতে শুরু করেছে ও সংশ্লেষিত যৌগ সারের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনাকে অনেক পরিমাণে কমাতে চেষ্টা করেছে। 'ট্র্যান ও ডাও'-এর পূর্বোল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায় বর্তমানে ভিয়েতনামে প্রায় 4,00,000 হেক্টর জমিতে শতাব্দীকালের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার প্রয়োগে উষ্ণাঞ্চলীয় **য়্যাজোলা *পিন্নাটার*** অবদান হল হেক্টর প্রতি 5 টন ধানের ফলন। আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO, 1977) তথ্যানুযায়ী এই উদ্ভিদ কুড়ি বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক চীন দেশে বর্তমানে 1,300,000 হেক্টর জমিতে নাইট্রোজেন সারের প্রধান উৎস।

কোনও স্থান বা অঞ্চলের জৈব পরিবেশে নতুন জীবের অনুপ্রবেশ কোনও অসাম্যের সৃষ্টি করছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখা বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক চেতনার বা বিবেচনার এক আবশ্যিক দিক। সুতরাং ধানচাষেও, তা' তার পদ্ধতিগত দিকই হোক বা সহচাষের দিকই হোক, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। ফলে, ধান চাষ পদ্ধতি চিরাচরিত প্রথার পরিবর্তনের অন্যতম বা বলা যায় আধুনিকতম সংযোজন হ'ল ধান চাষে বা ধানের জমিতে য়্যাজোলা'র অনুপ্রবেশ ঘটানো। ভারতবর্ষের পরিবেশে কি **য়্যাজোলা** বা তাঁর নিকট সম্পর্কিত কোন উদ্ভিদই কি ছিল না? —এ প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে জানা না থাকলেও আমরা দেখতে পাই আমাদের প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশে এর অবস্থিতি বহু প্রাচীন। বাতাবরণের নৈকট্য বা পরিবেশগত সাদৃশ্যের কথা চিন্তা ক'রে আমরা মোটামুটি অনুমান করতে পারি যে ধানের বাস্তব্য পরিবেশে **য়্যাজোলা** অনুপ্রবেশকারী নয়। তথাপি এ বিষয়ে আমাদের সম্যক জ্ঞান না থাকায় যে কোনও চাষের মতই **য়্যাজোলা** নামক উদ্ভিদটির প্রজাতি ও জাতি নির্বাচনে আমাদের যত্নবান হ'তে হয়।

2.1. উপযুক্ত প্রজাতি / জাতি ঃ

য়্যাজোলা'র ছ'টি প্রজাতির মধ্যে **পিন্নাটা'ই** এশিয়া মহাদেশের দেশগুলিতে বহুল পরিমাণে ব্যপ্ত যদিও জাপানে **ফিলিকুলয়ডিস্‌** পাওয়া যায়। আমরা জানি কোনও স্থানে কোনও প্রজাতির বহুল পরিমাণে প্রাপ্তি ঐ স্থানের সঙ্গে ঐ প্রজাতির বাস্তব্য সমতা বা আনুকূল্য প্রমাণ করে। আবার সাধারণভাবে স্থানীয় প্রজাতিগুলি উৎপাদিকা শক্তির দিক থেকে আমদানীকৃত প্রজাতি অপেক্ষা কম এবং অনেক সময়ে তার গুণগত মানও বিদেশী প্রজাতির তুলনায় নিম্নমানের হয়। কাজেই অভিপ্রেত উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক সময়েই স্থানীয় প্রজাতি বা জাতের শস্যের পরিবর্তে বিদেশী প্রজাতি বা জাতের চাষ করা কৃষি প্রযুক্তি বিদ্যার একটি দিক। আমদানী করার আগে বা তার ব্যাপক প্রচারের আগে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের কথা যেমন নতুন পরিবেশে ঐ আমদানীকৃত প্রজাতি বা জাত কতদূর ফলদায়ী ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব কি তা' খতিয়ে দেখা দরকার। পরিবেশগতভাবে **য়্যাজোলা'কে** ধানচাষের সহগ হিসাবে গ্রহণ করার সময়েও এই বিচার বিবেচনা অবশ্য কর্তব্য।

য়্যাজোলা পিন্নাটা'র ভারতে প্রাপ্ত জাতটি'র বৃদ্ধি ভালই, তবে অধিক উষ্ণতায়, প্রখর আলোক ও ফস্‌ফরাস্‌ ঘটিত খাদ্যের অভাবে পাতা লালচে হ'য়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কক, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালের আঞ্চলিক জাতগুলিও একই প্রতিক্রিয়া দেখায়। ভারতের কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের (CRRI) উপরি উল্লিখিত তথ্যে একটি বিশেষ দিক হ'ল ব্যাঙ্কক জাতটির শীত-সহনশীলতা অপেক্ষাকৃত বেশী। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্ত **ফিলিকুলয়ডিস্‌** ও **মেক্সিকানা** প্রজাতিগুলি ভারতের আবহাওয়া গ্রহণযোগ্য নয় বলেই প্রমাণিত হয়েছে। উল্লিখিত প্রজাতি ও আঞ্চলিক জাতগুলির চেয়ে ভিয়েতনামের জাতটির গুণগত মান বেশি বলে দেখা গেছে। **পিন্নাটা** প্রজাতির এই জাতটির বৃদ্ধিগত দিক যেমন ভাল তেমনই এর উচ্চতাপ সহনক্ষমতা ও ফস্‌ফরাস্‌ ঘটিত সারের অভাবজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া না থাকা সাধারণভাবে একটি অভিপ্রেত দিক। এর আরও সুবিধা হ'ল, প্রসারের জন্য স্থানান্তর করার সময় বেশী লাগলেও তুলনামূলকভাবে অন্যান্য প্রজাতি ও জাতগুলির চেয়ে অধিক পরিমাণে সজীব থাকতে পারে। কাজেই খরিফ মরসুমে ধানের সাথে এর চাষ করে জৈব সারের উপকারিতা লাভ করা

বিশেষভাবে স্থবিধাজনক এবং প্রসার করার স্থবিধাও এতে বেশী।

আটটি বিভিন্ন ধরনের য়্যাজোলার বৃদ্ধিগত ও তদুপজাত নাইট্রোজেন গত গুণগুলির বিচারে দেখা যায় যে সাধারণভাবে ছয়টি বিভিন্ন জাতের **য়্যাজোলা পিন্নাটা** অন্য দু'টি প্রজাতি যথা **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিস** ও **য়্যাজোলা মেক্সিকানা** অপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন। পূর্বেই বলা হয়েছে ব্যাঙ্ককের আঞ্চলিক জাতটি আবার **পিন্নাটা** প্রজাতির মধ্যে অনেক বেশী অভিপ্রেত গুণসম্পন্ন। বিশেষ করে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সর্বাপেক্ষা কম দৈর্ঘ্যের উজ্জ্বল সূর্যকিরণের দিনগুলিতেই ব্যাঙ্কক জাতের **য়্যাজোলা পিন্নাটায়** এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায়। য়্যাজোলার প্রাথমিক বৃদ্ধির হারের সঙ্গে নাইট্রোজেন নিবদ্ধীকরণ ক্ষমতা (পরিমাণ) সরাসরিভাবে সম্পর্কিত। **য়্যাজোলা পিন্নাটা'র** প্রাথমিক বৃদ্ধির হার অর্থাৎ বৃদ্ধি দ্বিগুণিত হওয়ার সময় অন্যান্য প্রজাতি অপেক্ষা বেশী এবং সেই কারণেই নাইট্রোজেন নিবদ্ধীকরণের পরিমাণও বেশী। জীবনচক্রের চারটি পর্যায়ের বৃদ্ধির গতি ও নাইট্রোজেন নিবদ্ধীকরণের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে এই প্রজাতিতে বিশেষ করে ব্যাঙ্কক জাতটিতে অন্যান্য জাত বা প্রজাতির তুলনায় অনেক বেশী এবং এ বিষয়ে ছায়ায় বা ছায়াহীন অবস্থার মধ্যেও ঐ একই ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে। অবশ্য ফিলিপাইনের আবহাওয়ায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছায়াচ্ছন্ন স্থানে বৃদ্ধিগত দিকটির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিস্** অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে বেশী শীত-সহনক্ষম, কাজেই এই প্রজাতিটিকে আমন ধান চাষের পর জমিতে জন্মিয়ে পরে অর্থাৎ বসন্তকালীন জমি চাষের সঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে জীবজ নাইট্রোজেন সারের ও মাটির গুণগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার স্থবিধা পাওয়া যেতে পারে। আবার এই শেষোক্ত প্রজাতিটি ও **মেক্সিকানা** গ্রীষ্মকালের ধানের সাথী-উদ্ভিদ হিসাবে চাষ করে দেখা গেছে যে প্রতি বর্গমিটারে 50 গ্রাম হিসাবে এই **য়্যাজোলা** সজীব অবস্থায় প্রয়োগ করে প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি করা যায় ও নাইট্রোজেনের আনুপাতিক পরিমাণ প্রায় নয়গুন বাড়ানো যায়। জমিতে এই **য়্যাজোলাকে** বাড়াবার জন্য প্রথম দেওয়ার দশদিন পরে প্রতিদিন প্রতি হেক্টরে 2·5 কেজি হারে নাইট্রোজেন নিবদ্ধ করতে পারে। জমিতে অনুপ্রবেশনের (inoculation) প্রায় 35 দিন পরে **য়্যাজোলার** বৃদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রতি হেক্টরের তা' শুষ্ক ওজনের প্রায় 1,700 কি.গ্রা.তে পরিণত হয় যা হেক্টর প্রতি নাইট্রোজেন আরোপ করে প্রায় পাঁচ কি.গ্রা.। ট্যালী ও

রেন্‌স্‌এর (1980) তথ্য থেকে জানা যায় **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিস্** এই 35 দিনের জীবনকাল থেকে 70 দিনের মধ্যে নাইট্রোজেন ক্রমাগত কমাতে থাকে।

2.2. য়্যাজোলা ও শ্যাওলার সম্পর্ক :

য়্যানাবিনা য়্যাজোলী (*Anabaena azollae*) নামে নীলচে-সবুজ শ্যাওলা জলে ভাসমান **য়্যাজোলার** পাতায় পিঠের দিকে মিথোজীবি সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ থাকে। **য়্যানাবিনার** দ্বারা নিবদ্ধীকৃত বায়বীয় নাইট্রোজেন, **য়্যাজোলা** তার নিজস্ব বৃদ্ধি ও বিস্তারের কাজে লাগায়। **য়্যানাবিনার** হেটেরোসিস্টের (heterocyst) সংখ্যার ও ব্যাপ্তির সাথে এই মিথোজীবি সম্পর্ক অনেকাংশে নির্ভরশীল। কাজেই য়্যানাবিনার পাতার উপর এই হেটেরোসিস্টের সংখ্যা ও ব্যাপ্তিগত দিকটির বিচার করা প্রয়োজন।

দেখা গেছে, **য়্যানাবিনার (য়্যাজোলার)** বৃদ্ধির সাথে হেটেরোসিস্টের সংখ্যা ও ব্যাপ্তির হারের একটি সাধারণ সম্পর্ক আছে। নতুন পাতায় হেটেরোসিস্ট প্রায় থাকে না ও তা' দ্বিতীয় পাতায় 9·5% থেকে ক্রমাগত বেড়ে পুরানো পাতায় 25% এ পরিণত হয় এবং পুরানো পাতার দেহকোষগুলি (vegetative cells) তুলনামূলকভাবে বেশ বড় হয়। হেটেরোসিস্টেই বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধীকৃত হয় সুতরাং এর সংখ্যার উপরই নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ নির্ভর করে। আরও দেখা গেছে যে মুক্ত অবস্থায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই নীলচে-সবুজ শ্যাওলা 1-2 (কদাচিৎ 4-5) μ mole C_2H_2 / mg protein / min পরিমাণ বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণে সক্ষম কিন্তু মিথোজীবি **য়্যানাবিনা য়্যাজোলী** 5-7 μ mole নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ করে। মিথোজীবি অবস্থায় হেটেরোসিস্টের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে সুতরাং এই সম্পর্কের দ্বারাই হেটেরোসিস্ট সৃজনের, দৈহিক অন্যান্য বৃদ্ধি ও নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ ক্ষমতা নিরূপিত হয় এবং য়্যাজোলার জীবন ও বৃদ্ধিও আনুপাতিকভাবে প্রভাবিত হয়। য়্যাজোলার পাতার গহ্বরে (cavity) অবস্থিত শ্যাওলা (য়্যানাবিনা) যে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে তা য়্যামোনিয়া হিসাবে ঐ গহ্বরে প্রদান করে ও য়্যাজোলার পাতার গহ্বরস্থিত রোমদ্বারা গ্লুটামিক্ সিন্‌থেটেজ্ (Glutamic synthetase) নামক জারক রসের সাহায্যে গ্রহণ করে। য়্যাজোলার পাতার

গহ্বরস্থিত বহিস্তকের কোষ থেকে যে রোম নির্গত হয় তাই এই মিথোজীবি উপাদান বিনিময়ের প্রধান ক্ষেত্র বলে মনে করা হয়। মিথোজীবি **য়্যানাবিনা য়্যাজোলীর** জাতটি কেবল শরীর কোষের গহ্বরেই পাওয়া যায় তা নয়, স্ত্রী জনন দণ্ডেও (megasporocarp) থাকে। মুক্ত বা মিথোজীবি **য়্যানাবিনার** জাত বা প্রজাতি ভেদ থাকতে পারে ও এই মিথোজীবিতা জীবন নির্বাহের বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্থাপিত হয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে স্বজীবি (free-living) **য়্যানাবিনাকে** য়্যাজোলার অনধিকৃত গহ্বরে কৃত্রিম ভাবে আরোপ করলে তা' সফলভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে পারে না। মিথোজীবি য়্যানাবিনায় হেটেরোসিস্ট কেবল সংখ্যায় বেশী থাকে না তার বহিরঙ্গ সংস্থানের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায় তা' হলুদ রং-এর হয় ও তার প্রান্তীয় গাঁট (polar nodule) বেশ স্পষ্ট হয়। মাটির স্থানীয় গুণগত বৈশিষ্ট্যও মিথোজীবিতাকে প্রভাবিত করে যেমন একই অবস্থায় আবাদ করা হায়দ্রাবাদের মাটিতে **য়্যাজোলার** মিথোজীবি য়্যানাবিনায় 22% হেটেরোসিস্ট হয় কিন্তু কটকের মাটিতে হয় 30% আর এতে দেহরজ্জু (filament) ও কোষও অধিকতর সজীব ও সুস্থ হয়। আবাদে প্রদত্ত রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার য়্যামোনিয়াম সালফেটের কোন প্রভাবই নেই হেটেরোসিস্ট গঠনের উপর।

মূলতঃ এই মিথোজীবিতার দ্বারা গড়ে প্রতি হেক্টরে প্রতিদিন প্রায় 1·4 কেজি নাইট্রোজেন জমিতে আসে। পরিমাণগত দিক থেকে তা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে শুঁটি জাতীয় গাছের দ্বারা আরোপিত নাইট্রোজেনের সাথে তুলনীয়। **য়্যাজোলা—য়্যানাবিনার** এই মিথোজীবিতায় প্রাপ্ত নাইট্রোজেনের সুবিধা হলঃ এক্ষেত্রে শুঁটি জাতীয় (Leguminous) গাছের দ্বারা নাইট্রোজেন আরোপণের যে বিরাম কাল (lag period) আছে তা' নেই, অর্থাৎ আবাদ শুরু ও নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণের মধ্যে তেমন কোন সময় নষ্ট হয় না।

2.3. য়্যাজোলার অনুকূল পরিবেশ ঃ

জীবের স্বাভাবিক জীবন নির্ভর করে তার পরিবেশের উপর, অর্থাৎ সার্থক জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি যে পরিবেশে প্রয়োজনমত পাওয়া যায় সেই পরিবেশই জীবনের সার্বিক বিকাশের পক্ষে অনুকূল। এই প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি যেমন তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য প্রধান ও অনুখাদ্যগুলি তেমনই

এইসব খাদ্যোপাদানের অভিপ্রেত ব্যবহার নির্দ্ধারণকারী পরিবেশের অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীবনধারণের জন্য গতি প্রকৃতি ও সঠিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। চলনক্ষম প্রাণীর পক্ষে তা'র অনুকূল পরিবেশ খুঁজে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়, কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে সব উদ্ভিদকে মানুষ তা'র প্রয়োজনে ব্যবহার করে তা'দের পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করতে হয় অথবা স্থানীয়ভাবে তা' সম্ভব না হ'লে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ চাষে তা'কে নির্বাচকের কাজ করতে হয়। ধান চাষে জমিতে **য়্যাজোলা** জন্মানোর ব্যাপারেও তাই এই সব মৌলিক তথ্যগুলি জানা দরকার।

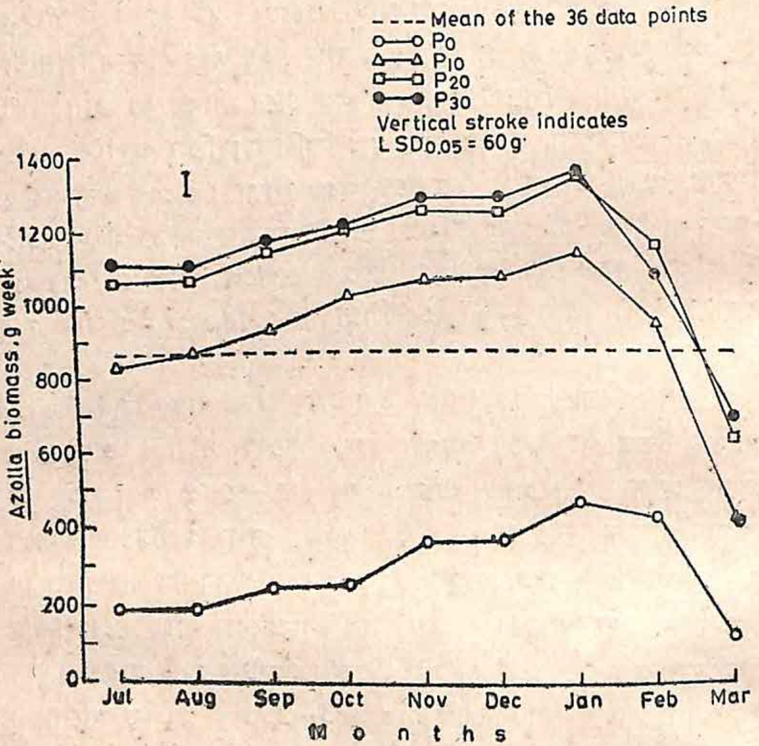
জমিতে বা জলে হাইড্রোজেনের ঘনত্ব (pH) : জমিতে য়্যাজোলা ব্যবহারই মুখ্য উদ্দেশ্য হ'লেও তার প্রসারের জন্য অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে নির্দিষ্ট আধারে এর চাষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জলপূর্ণ জমিতে **য়্যাজোলার** অভিপ্রেত বৃদ্ধি হয় 5-9 হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বে (pH), তবে কৃত্রিম জলাধারে এর প্রয়োজনীয় ঘনত্ব হল 5·5। প্রজাতিভেদে এই ঘনত্বের তারতম্য অবশ্যই হতে পারে যেমন **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিসের** অনুকূল ঘনত্ব 5-7। হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের প্রয়োজনীয় এই সীমার নিচে বা উপরে য়্যাজোলার বৃদ্ধি ও নাইট্রাজেন আবদ্ধীকরণ ক্ষমতা সবিশেষভাবে কমে যায়, এমনকি বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে অকালমৃত্যু ঘটাতে পারে। বৃদ্ধি ও নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণের এই অনুকূল হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের মধ্যেও আবার জলে অবস্থিত গ্রহণীয় লৌহের পরিমাণগত পার্থক্য য়্যাজোলার বৃদ্ধি প্রভাবিত করে। যেমন—প্রয়োজনীয় লৌহের পরিমাণ কম থাকলে এই সীমার মধ্যেই উচ্চ হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্ব **য়্যাজোলার** বৃদ্ধি ব্যাহত করে। **য়্যাজোলা পিন্নাটা'র** ক্ষেত্রে দেখা গেছে 5-8 হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্ব সাধারণভাবে বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল এবং 6 ঘনত্বেই অপেক্ষাকৃত ভালো বৃদ্ধি হয়। মনে করা হয় জলের লোহা ও ফস্‌ফরাস্ ঘটিত গ্রহণীয় উপাদান নির্ভর করে হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের উপর এবং অধিক ঘনত্বে অর্থাৎ ক্ষারীয় ঘনত্বে এই দুই উপাদানের গ্রহণীয়তা কমে যায়। এই বৃদ্ধিগত তারতম্য থাকলেও 5-9 হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্ব সীমায় প্রতি গ্রাম **য়্যাজোলার** সজীব ওজনে নাইট্রোজেনের পরিমাণগত পার্থক্য তেমন দেখা যায় না।

তাপ : য়্যাজোলা পিন্নাটা 14—40°C জলের তাপে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে তবে 20—30°C-এই এর অপেক্ষাকৃত ভালো

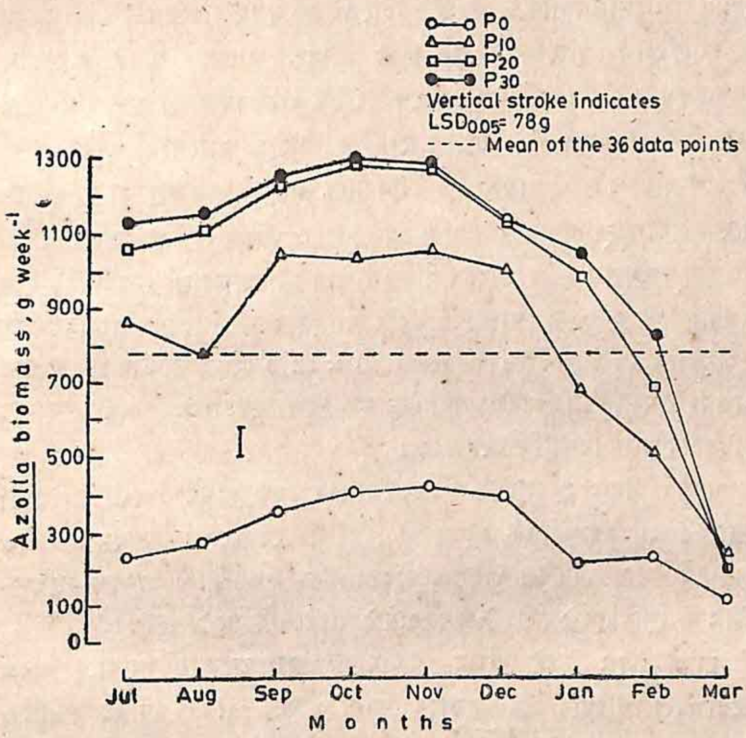
বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে, **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিসের** সুষম বৃদ্ধি হয় 22-25°C তাপ সীমার মধ্যে। 25°C-এর গড় তাপমাত্রা যুক্ত পরিবেশে **ফিলিকুলয়ডিস্** প্রজাতিটির বৃদ্ধি **পিন্নাটার** তুলনায় ভালো হয়। কেবল তাই নয়, জলের উপরিভাগ য়্যাজোলার দ্বারা আবৃত হয়ে গেলেও বাড়তি বৃদ্ধি অর্থাৎ কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি দ্বারা মোট জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়াতে পারে ও জলের উপর বেশ মোটা আবরনের সৃষ্টি করে। 25°C এর চেয়ে বেশী তাপে দুইটি প্রজাতির বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং এক্ষেত্রে **পিন্নাটার** গুণ তুলনায় ভাল। **পিন্নাটার** বৃদ্ধি লক্ষণীয় ভাবে ব্যাহত হয় তাপ 31°C এর বেশী হয়ে গেলে, সুতরাং দেখা যায় **ফিলিকুলয়ডিস্** প্রজাতিটি তাপে অধিকতর প্রভাবিত হয়। উচ্চতাপে অবশ্য **পিন্নাটাও** বেশ প্রভাবিত হয় —জলে এর জৈব উপাদানের পরিমাণ পরিপৃক্ততা লাভ করলে অধিকতরভাবে তা' বাদামী হয়ে যায় এবং নানা ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে বিনষ্ট হতে থাকে। দিনের তাপ 38°C হলে **পিন্নাটার** কোনও কোনও জাত মরে যেতে থাকে।

য়্যাজোলার ভৌগোলিক ব্যাপ্তির তথ্য থেকে জানা যায় এর অধিকাংশ প্রজাতিই শীতপ্রধান অঞ্চলে পাওয়া যায়, কাজেই সাধারণ ভাবে বলা যায় **য়্যাজোলা** শৈত্যমণ্ডলীয় উদ্ভিদ। পরীক্ষার তথ্যেও দেখা যায় উচ্চ তাপ সহনশীলতা এই উদ্ভিদের কম। ভারতের ন্যায় প্রধানতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে এর চাষে তাই কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শীতকালীন আবহাওয়া এর বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল পরিবেশ। রেখ চিত্র 1 এবং 2 থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে য়্যাজোলার বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত মাসগুলি হ'ল সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারী যখন জলের সর্বাধিক তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয় 34·3—28·1°C এবং গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা দাঁড়ায় 71·7—59·6% (দাস, 1989)। মার্চে য়্যাজোলার বৃদ্ধির হার খুবই কম কারণ এ সময় জলের সর্বাধিক (maximum) তাপমাত্রা 38°Cএ পৌঁছায় এবং এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে এরা অত্যধিক তাপমাত্রার জন্য মারা যায়।

আলোক ঔজ্জ্বল্য (Light intensity): খোলা মাঠে অধিক আলোকোজ্জ্বলতায় য়্যাজোলা ক্রমশঃ লাল হয়ে যায় কিন্তু একই পরিমাণ সূর্যালোকে, ছায়ায় তা' সবুজই থাকে। 40 k থেকে 55 k লাক্স পরিমাণ আলোকে য়্যাজোলার বৃদ্ধি খুবই ব্যাহত হয়। 4-5k লাক্স পরিমাণ আলোকে



রেখ চিত্র 1 : 1984-85 সালের বিভিন্ন মাসে য়্যাজোলার বৃদ্ধির-হার
(দাস, 1989)



রেখ চিত্র 2 : 1985-86 সালের বিভিন্ন মাসে য়্যাজোলার বৃদ্ধির হার
(দাস, 1989)

নাইট্রোজেনেজ এর ক্রিয়াশীলতা এক ঘণ্টাতেই সম্পৃক্ত অবস্থায় পৌঁছায়। লাল য়্যাজোলার সালোকসংশ্লেষণ ক্রিয়ার সম্পৃক্তি নাইট্রোজেনেজের প্রায় দ্বিগুণ গতিতে সম্পন্ন হয়। জাপানী বিজ্ঞানী ওয়াতানাবের (1978) পরীক্ষার তথ্য থেকে জানা যায়, নীচু ধান জমিতে 5 k, 10 k ও 40 k লাক্স আলোকের মধ্যে অধিকতর আলোকেই য়্যাজোলার বৃদ্ধি ভাল হয় এবং সম্ভবতঃ ধানের দ্বারা এই আলোকসম্পাত প্রতিহত হওয়াতেই তা সম্ভব হয়েছে।

আর্দ্রতা ঃ য়্যাজোলা জলাজমির উদ্ভিদ, কাজেই অধিক আর্দ্রতাই এর অনুকুল। চীনের চেকিয়াং প্রদেশে অবস্থিত মৃত্তিকা উর্বরতা গবেষণা কেন্দ্রের তথ্য থেকে জানা যায় 85-90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা য়্যাজোলা বৃদ্ধির পক্ষে সবচেয়ে অভিপ্রেত। আর্দ্রতার পরিমাণ 60% নীচে নামলে য়্যাজোলা শুকিয়ে যেতে থাকে, ভঙ্গুর হয়ে যায় ও নানা প্রতিকূলতায় সহনক্ষমতা হারায়।

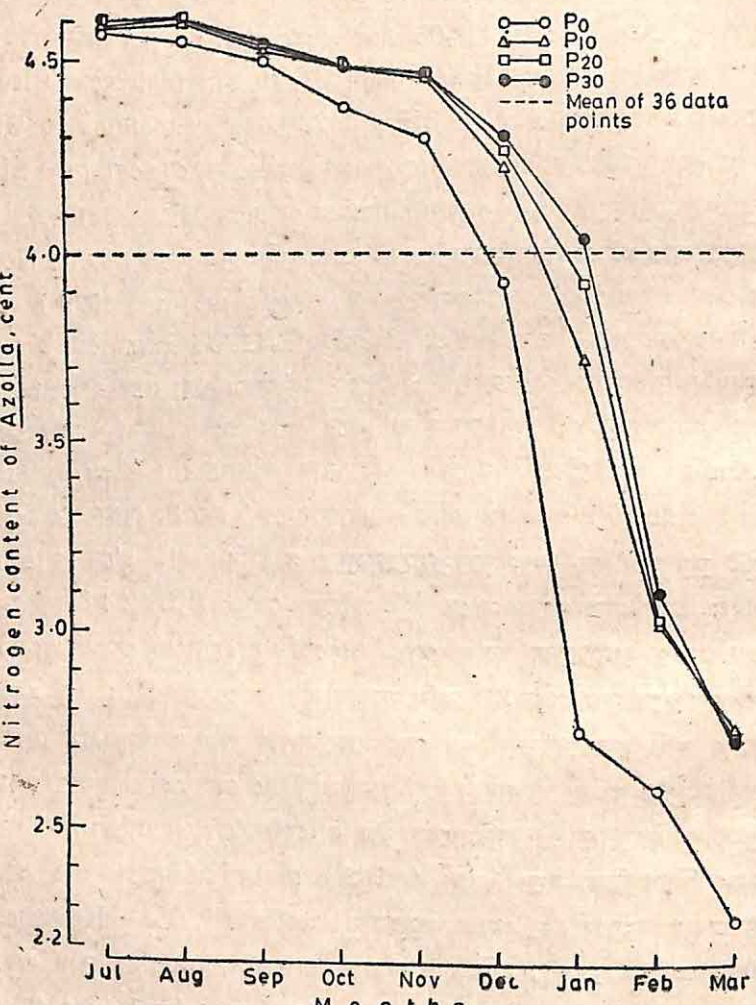
বায়ু সঞ্চালন ঃ বাতাসের গতির ধাক্কায় **য়্যাজোলার** আস্তরণ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে তা'র স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। সাধারণভাবে দেখা গেছে ছোট আকারের জমিতে ($20' \times 12'$) ঝড়ের ঝাপ্টায় য়্যাজোলার আস্তরণ জমির কিনারের দিকে জমা হয়ে যায় কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় আবার তা' সমান ভাবে বিস্তারিত হয়ে পড়ে।

ধাতব পদার্থ ঃ পরীক্ষিত য়্যাজোলার জাতগুলির মধ্যে **পিন্নাটা** প্রজাতির ব্যাংকক জাতটি ধাতব পদার্থের অভাবে অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবিত হয়। যাই হোক, বিভিন্ন ধাতবের অভাবজনিত লক্ষণগুলির প্রকাশ পারম্পর্য হ'ল ঃ ক্যালসিয়াম > লৌহ > ফস্‌ফরাস > ম্যাগনেসিয়াম > পটাশ।

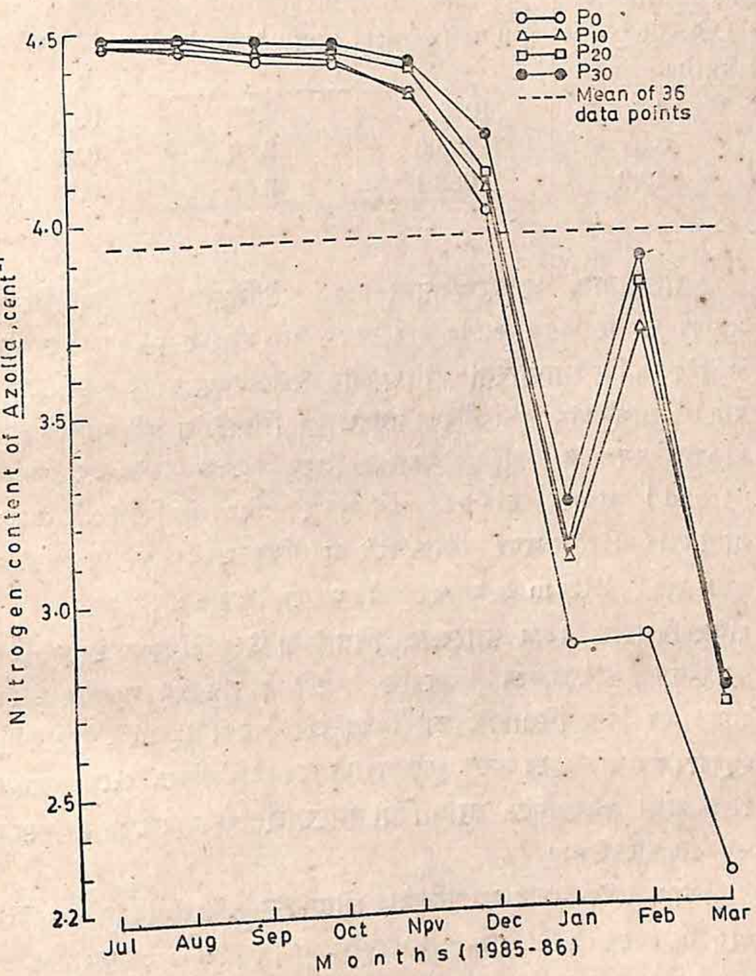
ফসফরাস্‌ ঃ এই ধাতব উপাদানটি **য়্যাজেলোর** আবাদে অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ এর অভাবে লালচে হয়ে যায়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা **য়্যাজোলার** সহিত এই উপাদানের প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে ও তুলনামূলক ভাবে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত এই ধাতব উপাদানটির কার্য্যকারিতার মূল্যায়নও করা হয়েছে। আবাদের শুরুতে প্রতি হেক্টরে প্রয়োজনীয় য়্যাজোলা বীজনের (inoculum) সহিত 4-8 কেজি. P_2O_5 হিসাবে সুপার ফস্‌ফেট মেশানো প্রয়োজন। এই পরিমাণ, 25 কেজি পর্যন্ত বাড়িয়ে দেখা গেছে, য়্যাজোলার বৃদ্ধি, ক্লোরোফিলের পরিমাণ ও নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ফস্‌ফরাসের মিশ্র ধাতবগুলির মধ্যে রক্‌ ফস্‌ফেট (Rock Phosphate) ও রত্না ফসফেটের (Ratna Phos-

phate) চেয়ে সুপার্ ফস্‌ফেটে বৃদ্ধি ভাল হয়। তেমনই ধানের জমিতে মূলসার হিসাবে ফস্‌ফেটে সার মাটিতে মিশিয়ে দিলে য়্যাজোলার বৃদ্ধিতে তা' তেমন উপকারে লাগে না কারণ মাটিতে এই উপাদান দ্রুত আবদ্ধীকৃত হয়। আদর্শ পরিবেশে 1 কেজি. P_2O5 য়্যাজোলার শারীরিক বৃদ্ধি এমন পরিমাণ করতে পারে যার দ্বারা 2·5 কেজি. পরিমাণ নাইট্রোজেন পাওয়া যেতে পারে। অনেক বিজ্ঞানীই, যথা রেন্‌স্ ও ট্যালি (1978), এবং ওয়াতানাবে ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ (1980) পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে মোটামুটি প্রতি হেক্টরে 15 কেজি. পরিমাণ ফস্‌ফরাস্ পর্যায়ক্রমে বা ভাগে ভাগে প্রদান করলে **য়্যাজোলার** অভিপ্রেত বৃদ্ধি হয় এবং এই মোট পরিমাণ সারকে ছয় বারে দিতে পারলেই তা' সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হয়। সুবুদ্ধি ও সিং (1979) এর পরীক্ষার ফল হতে জানা যায় যে 1.2 কেজি. k_2HP04 প্রদানে জৈববৃদ্ধি ও সবুজকণিকার পরিমাণ বেশ ভালো হয়, ফস্‌ফেটের পরিমাণ বাড়ালে য়্যাজোলার ঐ বৃদ্ধিগত দিকদু'টির উপর বিরূপ ক্রিয়া করে তবে দ্রবণীয় শর্করা ও য়্যামিনো (Amino) নাইট্রোজেন বাড়ে। প্রবাহমান আবাদের (Continuous flow culture) পরীক্ষায় সুবুদ্ধি ও ওয়াতানাবে (1979) দেখান যে জলে 0·66 ppm পরিমাণ ফস্‌ফরাসে **য়্যাজোলার** স্বাভাবিক বৃদ্ধি হ'তে পারে। আবার, দেখা গেছে ধানের ক্ষেতে প্রতি হেক্টরে 1 কেজি. P_2O5 2-4 দিন অন্তর দিতে থাকলে **য়্যাজোলা** এর প্রতিদানে 1·9 কেজি নাইট্রোজেন দেয়। স্থানীয় পরীক্ষার সূত্রে দেখা গেছে 8·8 কেজি. ফস্‌ফরাস্ প্রতি হেক্টরে দিলে এই সবুজ সারের বৃদ্ধি সবচেয়ে ভাল হয় এবং য়্যাজোলার জীবনে ফস্‌ফরাস্ একটি অত্যাবশ্যকীয় খনিজ উপাদান। নিচে সারণী থেকে বোঝা যাবে যে ফস্‌ফরাস্ উপাদান এই পরিমাণের কম বা বেশী হ'লে তা য়্যাজোলার উপর কেমন বিরূপ ক্রিয়া করে। দাস (1989) দেখান যে সারা বছর ধরে য়্যাজোলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফস্‌ফরাস্ অপরিহার্য। ইনি প্রতি সপ্তাহে 20 কেজি. P_2O_5 হেক্টর প্রতি প্রয়োগ করে য়্যাজোলার সর্বাধিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত (রেখ চিত্র। এবং 2)। য়্যাজোল্লার মধ্যে মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ সর্বাধিক থাকে জুলাই-আগষ্ট মাসে এবং শীতকালে ক্রমশঃ এর পরিমাণ কমতে থাকে (রেখ চিত্র 3 এবং 4)।

সারণী—1। য়্যাজোলার দৈহিক বৃদ্ধি, নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণের উপর ফস্‌ফরাস্ খনিজের প্রভাব—



রেখ চিত্র 3 : 1984-85 সালের বিভিন্ন মাসে য়্যাজোলার মধ্যে মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ (দাস, 1989)



রেখ চিত্র 4 : 19 4-85 সালের বিভিন্ন মাসে অ্যাজোলার মধ্যে মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ (দাস, 1989)

[মণ্ডল ও ভারতীর (1983) ভিত্তিতে]

পরীক্ষাক্রম (Treatment) Dose of p/-kg/ha	য়্যাজোলার সদ্য ওজন gm/m²/week	নাইট্রোজেনের পরিমাণ gm/m²/week	ফরফরাসের পরিমাণ gm/m²/-week
4.4	1016.4	2.22	0.09
8.8	1203.6	2.84	0.22
13.2	1068.1	2.35	0.18

ক্যাল্‌সিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও পটাসিয়াম ঃ ক্যাল্‌সিয়ামের অভাবে ও এই জলজ ফার্ণের বৃদ্ধি কেবল ব্যাহতই হয় না, লাল হয়ে যায় ও মিথোজীবি **য়্যানাবিনা য়্যাজোলীর** শরীরে গহ্বরের অপ্রাচুর্য্য দেখা যায়। ক্যাল্‌সিয়াম অভাবজনিত **য়্যাজোলা *পিন্নাটা'র*** এই লালচে হয়ে যাওয়া ফস্‌ফরাস্‌ জনিত অভাবের চেয়ে অনেক বেশী এবং পল্লব (frond) আকারে ছোট হয়। এই অভাবে বৃদ্ধির প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সাথে মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে যায় কিন্তু দ্রবণীয় শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। 2.0μ mole ঘনত্বের জলীয় মাধ্যমে এর বৃদ্ধি ভালো হয়।
ম্যাগ্‌নেসিয়ামের অভাব **য়্যাজোলা *পিন্নাটা'র*** উপর ফিলিকুলয়ডিস্‌ অপেক্ষা কম বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে। শেষোক্ত প্রজাতিটির বৃদ্ধি খুব লক্ষ্যণীয় ভাবে ব্যাহত হয় কিন্তু ***পিন্নাটায়*** তা' কেবল ছোট পল্লব (frond), পাতা কিছু হলুদবর্ণে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমশঃ ধুসর বাদামী হয়ে হঠাৎ শুকিয়ে যেতে থাকে। বেঁচে থাকা পল্লবগুলিতে **য়্যানাবিনা য়্যাজোলী** পাওয়া গেলেও মৃত পল্লবে তা' প্রায় থাকেই না।

পটাসিয়ামের অভাব **য়্যাজোলা *পিন্নাটা'র*** বৃদ্ধিকে তেমন প্রভাবিত করে না, তবে হেক্টর প্রতি 4-10 কেজি. পটাশ সার ও 50 কেজি. ছাই **য়্যাজোলার** বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বলে দেখা গেছে।

লোহা ও মলিব্‌ডেনাম্‌—য়্যাজোলার বৃদ্ধিতে লোহাঘটিত অনুখাদ্য প্রায় অপরিহার্য্য উপাদান। জলাধারের আবাদে (water culture) pH 6.5 এ লোহার অভাব দেখা যায় কিন্তু ধানক্ষেতে PH 7·0-এ ও লোহার অভাবের কোনও প্রতিফলন **য়্যাজোলায়** দেখা যায় না। সেচ-সেবিত জমিতে

প্রায়ঃশই লোহার অভাব দেখা যায় এবং অনুরূপ অবস্থায় হেক্টর প্রতি 1.5 কেজি. লোহার প্রয়োগে **য়্যাজোলার** বৃদ্ধিতে বিরূপ ক্রিয়া দূর করা যায়। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় ধান জমিতে এর এক দশমাংশ লোহা প্রয়োগই যথেষ্ট। **য়্যাজোলার** বৃদ্ধির পক্ষে লোহার আবশ্যকীয় ঘনত্ব (critical concentration) 20 μg/lit. বলে নিরূপিত হয়েছে।

নাইট্রোজেন বিহীন মাধ্যমে **য়্যাজোলার** আবাদে মলিব্ডেনামের ও কোবাল্টের প্রয়োজনীয়তা দেখা গেছে; তবে, সাধারণভাবে মলিব্ডেনাম্ প্রয়োগের কোনও প্রতিফলন এই জলজের বৃদ্ধিতে দেখা যায়নি।

নাইট্রোজেন—**য়্যাজোলা** মিথোজীবিতার মাধ্যমে **য়্যানাবিনার** সাহায্যে বায়বীয় নাইট্রোজেন সংগ্রহ ক'রে নিজের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখে। এই মিথোজীবিতা এমনই একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে কৃত্রিমভাবে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে **য়্যাজোলার** কোনও উপকারই হয় না বরং ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হয়। যেমন, এর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, দ্রবণীয় শর্করা কমে যায়, সবুজকণিকা ও হেটেরোসিস্টের পরিমাণ কমে যায়।

2. 4. য়্যাজোলার বহিরাঙ্গিক রূপ :—

এই উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হ'ল শাখায়িত, ভাসমান কাণ্ড, দ্বিবিভাজিত পাতা ও প্রকৃত মূল। পাতাগুলি একাদিক্রমে কাণ্ডের সাথে ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে ও এই পাতার পৃষ্ঠ ও অঙ্কদেশ সুনির্দিষ্ট থাকে। নতুন পাতার পৃষ্ঠদেশটি জলের উপরের দিকে থাকে অর্থাৎ প্রকাশ্যে থাকে ও এই দিকে সবুজকণিকা ও নির্দিষ্ট গহ্বর থাকে। এই গহ্বরেই নীলচে সবুজ শ্যাওলা, **য়্যানাবিনা য়্যাজোলী**, বাসা বাঁধে। পাতলা অঙ্কদেশ জলে নিমজ্জিত থাকে এবং বহুলাংশে সবুজকণিকা বিহীন। মিথোজীবি ঐ নীলচে-সবুজ শ্যাওলা **য়্যাজোলার** জীবন কালের বা পল্লব গঠনের সব পর্যায়েই থাকে। এই শ্যাওলার সাথে য়্যাজোলার খাদ্যবাহী নালিকা বা কলাসমূহের কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। শ্যাওলার দ্বারা আবদ্ধীকৃত বায়বীয় নাইট্রোজেন **য়্যাজোলার** শরীরে প্রবেশ করে এর পাতার পৃষ্ঠদেশীয় গহ্বরাভ্যন্তরে বহিস্ত্বকস্থ বহুকোষী রোমের মাধ্যমে। মিথো-জীবিতায় আবদ্ধ এই নীলচে-নবুজ শ্যাওলাটিকে য়্যাজোলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বনির্ভরভাবে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, মিথোজীবিতার

পর্যায়টি এই শ্যাওলার জীবন ধারণের পক্ষে এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যে একে বলা যায় বাধ্যতামূলক জৈব সম্পর্ক যা'র ফলে এর স্বাধীন জীবন যাপন করার ক্ষমতা বিনষ্ট হয়েছে। **য়্যাজোলা** সাধারণভাবে অযৌন পদ্ধতিতেই বংশ বিস্তার করে থাকে। তবে **য়্যাজোলাকে** স্বাভাবিকভাবে অপ্রতিহত অবস্থায় বৃদ্ধি করার সুযোগ দিলে এর সাথে যেসব নীলচে-সবুজ শ্যাওলা অবধারিতভাবে থাকবে তেমনই নির্দিষ্ট পরিসরে এই জলজ ফার্ণ যখন একটি মোটা আস্তরনে জলকে ঢেকে ফেলে সেই অবস্থায় এর যৌনবংশবিস্তারের জন্য স্ত্রীজননদণ্ড ও পুংজনন দণ্ড (Microsporocarp) দেখা দেয়। **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিসে** অনুরূপ অবস্থায় শৈত্যমণ্ডলীয় দেশের গ্রীষ্মকালে যৌনবংশবিস্তারী বিশেষ অঙ্গগুলির সৃষ্টি হয়। এই অঙ্গগুলি ছোট পল্লবের প্রথম পাতার অঙ্কদেশ থেকে যুগ্মভাবে নির্গত হয়। পুংঅঙ্গগুলি স্ত্রীজনদণ্ডগুলির তুলনায় বড় ও গোলাকার। পুংজনন দণ্ডে অনেকগুলি বীজন থলি (Microsporangium) থাকে ও এই বীজথলিতে massulae নামে বিশেষ অংশের উদ্ভব হয় যার ভিতর অণুবীজন বা পুংবীজনগুলি প্রচুর পরিমাণে থাকে। স্ত্রীজননদণ্ডে একমাত্র ডিম্বই তৈরী হয়।

2. 5. নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে য়্যাজোলা :—

স্বাভাবিক নিয়মে প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন বিভিন্নভাবে প্রবাহমান থাকে চক্রাবর্তনে। এই চক্রাবর্তনে জীবের নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। **য়্যাজোলা** তেমনই একটি মাধ্যম **যা'** এই নাইট্রোজেন চক্রাবর্তনে স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করে এক যৌথ জীবনযাত্রার সূত্রে। এই যৌথ জীবন হ'ল **য়্যাজোলা য়্যানাবিনার** মিথোজীবিতা। এরা যুগ্মভাবে তাদের শরীরের প্রতি গ্রাম শুষ্ক ওজনে প্রতিদিন 7-8 মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন আবদ্ধীকৃত করতে পারে। পরিমাণগত ভাবে এই হার হল সয়াবীন শিকড়গুটির (nodule) প্রায় এক চতুর্থাংশ। সাধারণভাবে, জমিতে **য়্যাজোলা** 106 দিন সময়ের মধ্যে হেক্টর প্রতি প্রায় 120 কেজি. নাইট্রোজেন প্রদান করতে পারে যা' বাৎসরিক হিসাবে দাঁড়ায় হেক্টর প্রতি 412 কেজি. নাইট্রোজেন। এই তথ্যগত হিসাব থেকে দেখা যায় গ্রীষ্ম বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় দেশগুলিতে **য়্যাজোলার** এই নাইট্রোজেন আরোপ করার ক্ষমতা শুঁটিজাতীয় উদ্ভিদের শিকড়-গুটির দ্বারা আরোপিত নাইট্রোজেনের পরিমাণের সাথে তুলনীয়। অবশ্য কিছু কিছু শুঁটিজাতীয় (leguminous)

গাছ, যেমন, **ডেস্‌মোডিয়াম্ ইন্‌টর্‌টাম্** (Desmodium intortum) ও **সেস্‌ব্যানিয়া ক্যানাবিনা** (Sesbania cannabaena) এর চেয়ে যথেষ্ট বেশী পরিমাণ, অর্থাৎ যথাক্রমে হেক্টর প্রতি 897 কেজি. ও 542 কেজি. নাইট্রোজেন জমিতে প্রদান করতে পারে।

প্রজাতি ও জাতভেদে বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ ক্ষমতার পার্থক্য **য়্যাজোলায়** বেশ দেখা যায়। ধানের ক্ষেতে **ফিলিকুলয়ডিস্** প্রজাতিটি 35 দিনের জীবনে প্রতি হেক্টরে 50 কেজি. নাইট্রোজেন আরোপ করতে পারে এবং তা' 60 দিনে 105 কেজিতে পৌঁছায়। পক্ষান্তরে **মেক্সিকানা** প্রজাতি সর্বপ্রকার অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও মাত্র 45 কেজি. নাইট্রোজেন জমিতে আরোপ করতে পারে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যায় যে **মেক্সিকানা** জমিকে পুরোপুরি আচ্ছাদিত করলেও **ফিলিকুলয়ডিসের** ন্যায় বহুস্তর বিশিষ্ট মোটা আচ্ছাদনের সৃষ্টি করতে পারে না। কাজেই মোট জৈব পদার্থের পরিমাণ **মেক্সিকানাতে** অনেক কম থাকে, ফলে নাইট্রোজেন প্রদান করার ক্ষমতাও কম। ট্যালি ও তাঁর সহকর্মীদের (Talley, et al., 1977) মার্কিন মুলুকের এই পরীক্ষিত তথ্যের সঙ্গে সিং প্রমুখ (1977) ভারতীয় বিজ্ঞানী ও কারামাইসেভ (1957) বা মুর (1969) ইত্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। সিং (1977) এর মতে 8-20 দিনের জীবনকালে **য়্যাজোলা** হেক্টর প্রতি প্রায় 8-10 টন মত সজীব জৈব উপাদান তৈরী করতে পারে। হেক্টর প্রতি 8-10 টন সজীব জৈব উপাদান থেকে 30 কেজি. নাইট্রোজেন পাওয়া যেতে পারে এবং এর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ করা সম্ভব যদি আবার দ্বিতীয়স্তরের বৃদ্ধি করানো যায়। উত্তর ভিয়েতনামে ধানের বীজ বপনের সময় থেকে পাশকাঠি ছাড়ার সময়ের ব্যবধানে 120-140 কেজি. নাইট্রোজেন প্রদানক্ষম হেক্টর প্রতি প্রায় 50 টন সজীব **য়্যাজোলা** জৈব উপাদান পাওয়া গেছে। লুসিয়ানাতে এক একরের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ জমিতে 3-4 মাসের মধ্যে প্রায় 7 টন সজীব য়্যাজোলা জৈব উপাদান পাওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রতি হেক্টরের 180 কেজি. ফস্‌ফরাস্ পাওয়া যায় এমন পরিমাণ সুপার ফস্‌ফেট দেওয়ায় জমি থেকে 7 সপ্তাহের মধ্যে 140 কেজি. নাইট্রোজেন য়্যাজোলা থেকে পাওয়া যায়। বেকিং (1975) এর C_2H_2 reduction পদ্ধতিতে নিরূপিত হিসাব থেকে জানা যায় ইন্দোনেশিয়ার পরিবেশে **য়্যাজোলা** বছরে প্রতি হেক্টর জমিতে 103-162 কেজি

নাইট্রোজেন আরোপ করতে পারে।

রেন্‌স্‌ ও ট্যালীর (Rains and Talley, 1979) পরীক্ষা সূত্রে জানা যায় যে আমেরিকায় জমিতে **য়্যাজোলা** অনুপ্রবেশনের প্রায় 10% জমি ঢাকতে পারে যা' থেকে হেক্টর প্রতি 1·5 কেজি. নাইট্রোজেন পাওয়া যায় এবং 15 দিনে জমি পুরোপুরি ঢেকে গিয়ে নাইট্রোজেন প্রদান প্রায় 9 গুণ বাড়িয়ে দেয়। 15-25 দিন বয়সকালে দৈনিক প্রতি হেক্টরে 2 কেজি. পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রদানের হার থাকে এবং 35 দিনে জমি পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হ'লে প্রতি হেক্টরে শুষ্ক জৈব উপাদানের পরিমাণ দাঁড়ায় 1700 কেজি. যা' থেকে 52 কেজি. নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। **য়্যাজোলা** অবিলম্বে পচে গিয়ে য়্যামোনিয়ায় পরিণত হয় এবং তা' ধানে অজৈব য়্যামোনিয়া সার হিসাবে কাজে লাগে। অবশ্য বৃদ্ধিকালেও **য়্যাজোলা** ক্রমাগত জলে য়্যামোনিয়া নাইট্রোজেন যোগ করতে থাকে।

2. 6. জলের গুণবর্ধনে য়্যাজোলা ঃ

আবদ্ধ বা ধীর প্রবাহমান জলাশয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন রাসয়ানিক পদার্থ পড়ে ও তা' আয়নায়িত হয় বা যৌগ অবস্থায় থেকে জল দূষণ করে। বিভিন্ন যৌগ বা আয়নমিশ্রিত অনুরূপ জল মানুষের বিভিন্ন ব্যবহারে অনুপযুক্ত হ'তে পারে। কিন্তু এগুলিই আবার বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদের দ্বারা অপসৃত হয় তাদের শরীরে খাদ্য হিসাবে গৃহীত হ'য়ে। এব্যাপারে জলজ ফার্ণ **য়্যাজোলার** ভূমিকা নিয়ে কোনও পরীক্ষিত তথ্য প্রমাণ হিসাবে নেই। তবে আমেরিকার নিউ জার্সিতে অবস্থিত একটি ঔষধ নির্মাণ কারখানার সূত্র থেকে জানা যায় যে ঐ কারখানার প্রয়োজনীয় জল পরিশোধন করতে গিয়ে লক্ষ্য করা গেছে যে একটি খালের জল, যেখানে **য়্যাজোলা** স্বাভাবিক ভাবে জন্মেছে, অন্য সূত্রের থেকে নেওয়া জলের চেয়ে সহজে পরিশ্রুত হয়। মনে করা হয় যে **য়্যাজোলা** জন্মানোর ফলেই জলের দূষিত পদার্থ বহুল পরিমাণে অপসৃত হয়ে গেছে।

2. 7. মুরগীছানার খাদ্য হিসাবে য়্যাজোলা ঃ

জনসংখ্যার নিরন্তর বৃদ্ধি ও তার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রাণীজ উপাদানের চাহিদা মেটাতে পৃথিবীর স্থলভাগের উৎপাদন বোধ হয় আর পর্যাপ্ত নয়। তাই আজকাল মনে করা হয় যে স্বাদু জলাধারে বা সমুদ্রের জীবজ

উপাদানই এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারবে। জলজ উদ্ভিদের তাই ব্যবহারিক মূল্যায়ণ শুরু হয়ে গেছে। কচুরীপানা, **হাইড্রিলা, লেম্না** ইত্যাদির মৌল আমিষ (crude protein) ও মৌল তন্তুর (crude fibre) পরিমাণ আল্ফাল্ফার সাথে তুলনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য এই সব উদ্ভিদে মোট ছাই এর পরিমাণ ও হলুদ রঞ্জকের পরিমাণ বেশী থাকে। গৃহপালিতের খাদ্য হিসাবে **য়্যাজোলায়** ধাতব পদার্থের পরিমাণ সাধারণভাবে প্রাপ্ত প্রস্তুত খাদ্যের তুলনায় বেশী থাকে কিন্তু অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের চেয়ে কম থাকে। স্ববুদ্ধি ও সিং (1978) এর পরীক্ষার তথ্য থেকে জানা যায় যে সজীব সবুজ **য়্যাজোলা** মুরগীছানার বেশ প্রিয় খাদ্য এবং বয়স্ক বাদামী রং এর গাছের চেয়ে ছোট, প্রায় শিকড়হীন **য়্যাজোলাই** এদের কাছে অধিকতর অভিপ্রেত। মনে করা হয়, প্রস্তুত খাদ্যের পরিমাণ প্রায় 25% কমানো যায় **য়্যাজোলাকে** বিকল্প খাদ্য হিসাবে হাঁস-মুরগী পালনের খাদ্য তালিকায় যদি অন্তর্গত করা হয়। এই নতুন বিকল্প খাদ্যে সুফলই পাওয়া যাবে কারণ এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া মুরগীছানা নিয়ে পরীক্ষায় এতাবৎকাল পাওয়া যায়নি। প্রস্তুত খাদ্যের (commercial feed) দুর্মূল্যতার জন্য এই আংশিক বিকল্প হিসাবে **য়্যাজোলার** ব্যবহারকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, 100 পাখীর একটি মুরগী খামারের জন্য প্রতিদিন 9 কেজি. হারে তাজা **য়্যাজোলা** দিয়ে 20% প্রস্তুত খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে হলে 60 বর্গমিটার পরিসরে 30 সেমি. গভীর চৌবাচ্চা এক সপ্তাহের প্রয়োজন মেটাতে পারে। কেবল মুরগীপালনই নয়, কটকের কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে অন্যান্য জন্তুর খাদ্য হিসাবেও **য়্যাজোলার** ব্যবহার প্রচলন করা যেতে পারে।

2. 8. কৃষিকর্মে য়্যাজোলা :

চাষ আবাদে **য়্যাজোলার** ব্যবহার শতাব্দী প্রাচীন অভ্যাস। ভিয়েতনামে ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে ঐ দেশে ধানের জমিতে **য়্যাজোলার** উপযোগিতা সেখানে ফরাসী ঔপনিবেশিকদের আগে থেকে জানা ছিল। সেকালের স্বাভাবিক বা পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করা জ্ঞানই ছিল এই দ্বৈত চাষের অবলম্বন। বর্তমান কালের নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চাষের এই সহজাত অভ্যাসের নানা

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও তা'র প্রয়োগকে আরও যুক্তিসিদ্ধ করেছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, **য়্যাজোলার** ব্যবহারে ধানের উৎপাদন 14-40% বাড়ানো যেতে পারে (মুর্, 1969)।

এক হেক্টর জমি **য়্যাজোলার** দ্বারা পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হ'লে পরিণত অবস্থায় প্রায় দশটন সদ্য ওজনের জৈব উপাদান পাওয়া যায় যা' পচনের পর জমিতে 30 কেজি. নাইট্রাজেন আরোপ করতে পারে। সহজেই অনুমান করা যায়, এই পরিমাণকে দ্বিগুণ করার বিষয় যদি প্রথম স্তরের **য়্যাজোলাকে** মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে অথবা সরিয়ে নিয়ে পুনরায় **য়্যাজোলা** অনুপ্রবেশন করা হয়। **য়্যাজোলাকে** মাটিতে মিশিয়ে দেবার 8-10 দিনের মধ্যেই তা' পচে যায়। কাজেই, মাটিতে মিশিয়ে দেবার অনতিকাল পরই ধানের চারা রোপন করার কোনও অসুবিধা থাকে না এবং মাটিতে মেশাবার পর বিভিন্ন সময়ে ও মেয়াদের ধান রোপন করে উৎপাদনের কোনও তারতম্য লক্ষ্য করা যায় নি। তবে ধান রোপন করার 7-10 দিন আগে একস্তর **য়্যাজোলা** মাটিতে দেবার পর রোপনের সময় আর একবার মেশালে ধানের চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মনে করা হয়, এই ধরনের মেশানোর ফলে ধানের চারার পক্ষে নাইট্রোজেন পাওয়া সহজতর হয়। ম্যানিলার আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের পরীক্ষার ফল থেকে জানা যায় যে **য়্যাজোলা** থেকে নাইট্রোজেন প্রাপ্তির গতি বেশ ধীরে এবং তা' য়্যামোনিয়াম্ সাল্‌ফেট্ নামক রাসায়নিক সারের তুলনায় 70%।

অন্য যে কোন জীবের মত **য়্যাজোলারও** স্বাভাবিক মৃত্যু আছে। কাজেই তা' জমিতে মিশিয়ে না দিলেও নির্দিষ্ট জীবনকালের পর তা' শুকিয়ে গিয়ে মাটিতে মিশে যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হেক্টর প্রতি 8-10 টন **য়্যাজোলা** ঐরকম স্বাভাবিক ভাবে মিশে যেতে দিলে বা অন্য উপায়ে মিশিয়ে দিলে ঐ জমি থেকে 47% পর্যন্ত অধিক উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে। শুধু ধানের উৎপাদনই নয় অনুরূপ হারে খড়ের (straw) উৎপাদনও বাড়ে। নির্দিষ্ট পরিসর জমিতে **য়্যাজোলার** প্রয়োগ বৃদ্ধি করলে আনুপাতিক হারে ধানের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। রাসায়নিক সার প্রয়োগের সঙ্গে য়্যাজোলা প্রয়োগের তুলনামূলক পরীক্ষায় দেখা গেছে হেক্টর প্রতি 8-10 টন ওজনের একস্তর **য়্যাজোলা** প্রয়োগে ধানের উৎপাদন 30 কেজি. হারে রাসায়নিক সারের মাধ্যমে প্রযুক্ত নাইট্রোজেনের সঙ্গে তুলনীয় যদিও শেষোক্ত

সার প্রয়োগে ধানের প্রাথমিক পর্যায়ের বৃদ্ধি ভাল হতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আরও পরীক্ষিত তথ্য থেকে জানা গেছে যে হেক্টর প্রতি 30 বা 50 কেজি. নাট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সারের মাধ্যমে প্রদত্ত মূল সারের সঙ্গে পূর্বোক্ত পরিমাণ **য়্যাজোলা** মাটিতে মিশিয়ে দিলে হেক্টর প্রতি 60 বা 80 কেজি. নাইট্রোজেন কেবল য়্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্ হিসাবে দেওয়ায় ধানের যে উৎপাদন পাওয়া যায় তারই সমপরিমাণ উৎপাদন পাওয়া গেছে। এই পরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে পূর্বোক্ত পরীক্ষাক্রমে পাশকাঠির সংখ্যা ধানের ছড়ার সংখ্যা বা ওজন ইত্যাদি উৎপাদন প্রভাবকারী বৈশিষ্ট্যও উৎসাহজনকভাবে বেশী হয়। ধান রোপনের পর য়্যাজোলা অনুপ্রবেশনের দ্বারাও উৎসাহজনক ফললাভ করা সম্ভব। প্রতি বর্গমিটার জমিতে 0·1 কেজি. **য়্যাজোলা** বীজন, ধান রোয়ার পর অনুপ্রবেশন করালে তা' 20-30 দিনেই সমস্ত জমিতে একটি স্তরে আচ্ছাদিত করতে পারে। এই সময়ে জমির জল নিকাশ করে ঐ **য়্যাজোলাকে** মিশিয়ে দিলে কিছু দিনের মধ্যেই তার প্রতিফলন হিসাবে ধান গাছের সবুজ রঙ আরও ঘন হ'তে দেখা গেছে, গাছের বৃদ্ধি দ্রুততর হ'তে ও শীঘ্র ফুলন্ত হতেও দেখা গেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি 400 কেজি. অধিক উৎপাদন পাওয়া গেছে যা' ধান রোপনের পূর্বে সমপরিমাণ **য়্যাজোলা** মাটিতে দিলে বা 30 কেজি. রাসায়নিক নাইট্রোজেন মূল সার হিসাবে প্রয়োগ করলে 1200 কেজি. ধান উৎপাদনের তুলনায় লক্ষ্যণীয় ভাবে কম। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা উচিৎ যে হেক্টর প্রতি 10-15 টন **য়্যাজোলা** চাপান হিসাবে ব্যবহার আরও বেশী ফলপ্রসূ হয়। খরিফ মরসুমে জমিতে **য়্যাজোলা** থাকা অবস্থায় চারা রোপন করলে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, জলের কমা বাড়ার ফলে সদ্য রোপন করা চারাগুলিতে **য়্যাজোলা** জড়িয়ে গিয়ে চারার বৃদ্ধি ব্যাহত করে। সুতরাং জমিতে **য়্যাজোলা** অনুপ্রবেশনের সঠিক সময় হ'ল চারা রোপনের কিছুদিন পর যখন চারাগুলি সঠিকভাবে জমিতে লেগে গেছে সেই সময়ে। এর উপরি সুবিধা হ'ল চারার প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে **য়্যাজোলার** দ্রুত বৃদ্ধি ও আচ্ছাদন আগাছা দমনে সাহায্য করে।

আমেরিকার ক্যালফোর্নিয়ায় একটি পরীক্ষার তথ্য থেকে জানা যায় যে ধান রোপন করার আগে **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিস্** জমিতে আবাদ করে মিশিয়ে দিলে ও রোপনের পর **য়্যাজোলা মেক্সিকানা** জমিতে অনুপ্রবেশন

ও সঠিক পর্যায়ে মাটিতে মেশালে এদের যুগ্ম ক্রিয়ায় জমিতে হেক্টর প্রতি 98 কেজি. নাইট্রোজেন আরোপিত হয় যার ফলে **য়্যাজোলা** বা রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার বিহীন জমির থেকে হেক্টর প্রতি 2.2 টন ধান বেশী পাওয়া যায় (ট্যালী ও সহকর্মীবৃন্দ, 1977)। জাপানে পরীক্ষাক্রমের তথ্য থেকে ওয়াতানাবে (1978) জানাচ্ছেন যে শুখা মরসুমে ধানের (IR 30) জমিতে **য়্যাজোলা** অনুপ্রবেশ করিয়ে তা' রোয়ার 40 দিন পরে মাটিতে মিশিয়ে দিলে সাধারণ জমির চেয়ে 12-25% বা হেক্টর প্রতি 300-700 কেজি. পর্যন্ত বেশী ধান পাওয়া যায়। এই মরসুমে ধান রোপনের আগে একবার **য়্যাজোলার** আবাদ করে আরও বেশী সুফল পাওয়া সম্ভব, কারণ, সেই সময়টি **য়্যাজোলার** বৃদ্ধির পক্ষে অধিকতর অনুকূল। ধান রোপনের আগে চার বার ও রোপনের পর দু'বার **য়্যাজোলার** আবাদ করতে পারলে সর্বাধিক 36% বেশী বা হেক্টর প্রতি 1.9 টন বেশী ধান পাওয়া যেতে পারে। উত্তর পূর্ব থাইল্যাণ্ডে দেখা গেছে (Sawatdee *et al.*, 1978) বালি মাটিতে **য়্যাজোলার** বৃদ্ধি ভাল হয় এবং ধানও এতে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার মূলসার ও চাপানসার হিসাবে প্রয়োগের থেকে বেশী উপকৃত হয়। কারণ, এই ধরনের জমিতে ধনাত্মক আয়ন পরিবর্ত ক্ষমতা (Cation exchange capacity) বেশী থাকে এবং মোটা দানার দরুন নাইট্রোজেন দ্রুততর নষ্ট হয়, **য়্যাজোলা** বেশী ধীর গতিতে নাইট্রোজেন আরোপ করে ব'লে এই ক্ষতি তেমন হ'তে পারে না। ভারতীয় বিজ্ঞানী সিং (1977) এর ধারাবাহিক অন্বেষণের তথ্য ভিত্তিক পূর্বোক্ত আলোচনার সাথে ওনারই আরও কিছু তথ্য উল্লেখ এই প্রতিবেদনকে পূর্ণতর করবে। তিনি দেখেন যে, **য়্যাজোলা** প্রয়োগে স্বল্প মেয়াদী, যথা, সুপ্রিয়া ও কলিঙ্গ 2 জাতের ধানে এবং মধ্য মেয়াদী, যথা, IR 8 ও CR 1005 জাতের ধানের অপেক্ষা অধিকতর ফলদায়ী এবং রবি মরসুমে খরিফ মরসুম অপেক্ষা **য়্যাজোলা** বেশী ক্রিয়াশীল। মনে করা হয় যে মধ্যমেয়াদী ধান বেশী সময় আবদ্ধ জলে থাকে এবং সেই কারণে এর নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তাও বেশী। সিং এর সমস্ত পরীক্ষালব্ধ তথ্য পূর্বোক্ত বিদেশী বিজ্ঞানীদের তথ্যেরই স্থানীয় পরিবেশে ও প্রযোজ্য বলে প্রত্যায়িত করেছে। একইভাবে তিনিই আরও দেখেন যে, রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের সহগ হিসাবে বা পরিপূরক হিসাবে **য়্যাজোলার** ব্যবহারে কোনও অসুবিধা নেই এবং **য়্যাজোলা** জমিতে মিশিয়ে না দিলেও লাভজনক উৎপাদনই

পাওয়া সম্ভব। স্থানীয়ভাবে, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকেও প্রায় অনুরূপ ফলই লাভ করা গেছে। যেমন—খরিফ মরসুমে হেক্টর প্রতি 5 টন য়্যাজোলা মূল সার হিসাবে একবার ও পরে পাশকাঠি ছাড়ার সময়ে আর একবার ঐ হারে জাপানী নিড়ানীর' সাহায্যে মাটিতে মিশিয়ে দিলে অথবা শুখা মরসুমে রাসায়নিক সারের সঙ্গে হেক্টর প্রতি দশ টন **য়্যাজোলা** মূল সার হিসাবে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে হেক্টর প্রতি 30 কেজি. রাসায়নিক সারের প্রয়োজন কমানো সম্ভব (মণ্ডল ও ভারতী, 1983 খ)।

য়্যাজোলা ব্যবহারের কিছু প্রাথমিক পরিচর্যাগত দিক :—

য়্যাজোলার সাধারণ পরিচিতি, মানুষের জীবনে তার বিভিন্ন উপযোগিতার দিক, বিশেষ করে কৃষিকর্মে এর প্রয়োগ-সম্ভাবনা আলোচনার পর স্বাভাবিক ভাবেই এই উদ্ভিদটি ব্যবহার করতে হলে তারও পরিচর্যার কথা পর্যায়ক্রমে জানার দরকার হয়ে পড়ে। পূর্বেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনও ফসলের আবাদ করার মতই স্থানীয় পরিবেশে **য়্যাজোলার** জৈবিক প্রক্রিয়া কি হয় তা' জেনে রাখতে হবে। এই পর্যায়ের পরই **য়্যাজোলার** বৃদ্ধি ও প্রসারের পদ্ধতিগত দিকটির বিষয় এসে পড়ে কারণ এই উদ্ভিদের স্বাভাবিক জন্ম-মৃত্যুর জীবন চক্রকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করতে হবে।

সৃজন-বৃদ্ধি (Multiplication) :—ভারতবর্ষে ধান জমিতে বা অন্যান্য জলা জায়গায় **য়্যাজোলা** ব্যাপকভাবেই জন্মায় কিন্তু এই প্রাকৃতিক জৈব সম্পদটিকে ব্যবহারিক প্রয়োগের তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি কিছুকাল আগেও। এই শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রারম্ভে বা ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের কৃতী বিজ্ঞানী ডঃ সিং এই প্রাকৃতিক বা বায়বীয় নাইট্রোজেনের সদ্ব্যবহারক উদ্ভিদ **য়্যাজোলা** সম্পর্কে বিষদভাবে গবেষণা আরম্ভ করেন ও তিনিই এই উদ্ভিদটির ব্যবহারিক প্রয়োগের ও মৌলিক জ্ঞানের কয়েকটি দিক উন্মোচন করতে সমর্থ হন।

কোনও প্রাকৃতিক জৈব বা অজৈব উপাদান ব্যবহারের প্রাথমিক পর্যায়ই হ'ল ঐ উপাদানের মৌলিক গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা। **য়্যাজোলার** রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শুষ্ক ওজনের ভিত্তিতে এতে থাকে 10·5% ছাই (ash), 3-3·7% অবিভাজিত স্নেহজাতীয় পদার্থ (crude fat), 24-30% অবিভাজিত আমিষ জাতীয় পদার্থ (crude protein), 4-5% নাইট্রোজেন, 0·5-0·9%

ফস্‌ফরাস, 0·4-1·0% ক্যালসিয়াম, 2-4·5% পটাশিয়াম, 0·5-0·65% ম্যাগনেসিয়াম, 0·11-0·16% ম্যাঙ্গানীজ, 0·06-0·26% লোহা, 3·5% দ্রবণীয় শর্করা জাতীয় উপাদান, 9·1% অবিভাজিত তন্তু (crude fibre), 6·5% শ্বেতসার জাতীয় উপাদান, এবং 0·45% সবুজ রঞ্জক পদার্থ-'ক' (chlorophyll a) (সিং ও সুবুদ্ধি, 1977 ; সুবুদ্ধি ও সিং 1977)। এই রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, এই উদ্ভিদের জীবনধারণের সঠিক গতি বজায় রাখতে হলে কোন কোন মৌলিক উপাদানের প্রয়োজন হতে পারে। সহজেই বোঝা যায়, জীবন নির্বাহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে বেশ কিছু যৌগ পদার্থ তৈরী হয় জীবের শরীরে, তবে সবকিছুর মৌলিক উপাদানগুলির আহরণ করতে হয় পরিবেশ থেকে। পরিবেশে এই মৌলিক উপাদানের পর্যাপ্ততা জীবের সার্থক জীবন নির্বাহ নিরূপণ করে। অবশ্যই পরিবেশে মৌলিক উপাদান গুলির অবস্থিতিই যথেষ্ট নয়, সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হ'ল ঐগুলি জীবের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকা। আবার জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন **হয়,** সুতরাং সেই পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বা মৌলিক পদার্থটির সঠিকভাবে সরবরাহ থাকা দরকার। **য়্যাজোলার** জীবনগতির পর্যালোচনায় আমরা দেখেছি যে এর জীবনের একটি বিশিষ্ট দিক হল **য়্যানাবিনার** সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য মিথোজীবিতা, এই মিথোজীবিতার সূত্রেই **য়্যাজোলা** তা'র জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পায় বাতাস থেকে। নাইট্রোজেনের অসীম ভাণ্ডার বাতাস থেকে এই নাইট্রোজেন **য়্যানাবিনা** আহরণ করে **য়্যাজোলা'তে** আরোপ করে। কাজেই **য়্যাজোলার** আবাদে নাইট্রোজেনের কৃত্রিম প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন, কেবল তাই নয় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ **য়্যাজোলার** বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে—অকালে তা' লালচে হয়ে যায় অর্থাৎ তার স্বাভাবিক সজীবতা নষ্ট হয়, সূর্যালোকের সদ্ব্যবহার বিঘ্নিত হয়। অন্যান্য মৌল উপাদানগুলির প্রয়োজনীয়তার পূর্বালোচনা থেকে আমরা অনেক তথ্য জানতে পেরেছি এবং তা'দের সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের কথা শুরু করার আগে **য়্যাজোলার** ঘনিষ্ঠ পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটা প্রাথমিক প্রয়োজন। এই জলজ উদ্ভিদটির জলীয় পরিবেশের বা মাটির সর্বাপেক্ষা উপযোগী pH হল 5·5-7·0। মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, pH 3-3·5 এ **য়্যাজোলা** বাঁচতে পারে না, যদিও pH 10 এ' তারা জীবন টিকিয়ে রাখতে পারে (এস্টোন ও ওয়াম্‌সলে, 1976)। **য়্যাজোলার** দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অনুকূল জলীয় তাপ হ'ল

20-30°C যদিও সর্বনিম্ন 14°C ও সর্বোচ্চ 40°C জলের তাপমাত্রায় **য়্যাজোলা** বেঁচে থাকতে পারে। ঘন ঘন বৃষ্টিপাত **য়্যাজোলার** বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তবে অধিক বৃষ্টিতে ভেসে গিয়ে খালে-নালায় বা অন্যত্র জমা হ'তে পারে এবং বাতাসের বেগ বেশী থাকলে আস্তরণ ভেঙে গিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে বা জমির কিনারে জমা হয়ে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব যদি বড় আকারের জমির মধ্যে আইল তুলে ছোট ছোট কোঠা করা হয় এবং এই পদ্ধতিতে প্রায় নির্বিঘ্নে **য়্যাজোলা** এক সপ্তাহে 2-6 গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। সাধারণভাবে, সপ্তাহান্তরে **য়্যাজোলা** অপসারণ বা জমিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তবে একে নির্বিবাদে বাড়তে দিলে য়্যাজোলা স্তরীভূত হ'তে থাকে ও এক সময়ে নিচের স্তরের উদ্ভিদগুলি পচতে শুরু করে। এছাড়াও দীর্ঘ সময় ধরে **য়্যাজোলা** অপসারণ না করলে এদের জনন-অঙ্গ তৈরী হ'তে থাকে এবং এই জননাঙ্গের (Sporocarp) মাত্রাধিক পর্যায়ে পৌঁছালে এই উদ্ভিদের বৃদ্ধিও মন্থর হ'তে থাকে।

যাহোক, প্রতি বর্গ মিটারের 0·1-0·3 কেজি. হারে **য়্যাজোলা** অনুপ্রবেশনে বা বপনে ও জমিতে 2-3 সেমি. পরিমাণ জল আবদ্ধ রাখতে পারলে সর্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে এর বৃদ্ধি হ'তে দেখা যায়। এই পরিমাণের কম হারে বপন করলে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি আচ্ছাদন করতে বেশী সময় লাগে ও সৌর শক্তির পূর্ণ আকাঙ্খিত ব্যবহার সম্ভব হয় না। এই নির্দিষ্ট হারে **য়্যাজোলা** জমিতে বপন করলে, বারবার পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে তা' 8-20 দিনে 8-15 টন টাট্‌কা (fresh) **য়্যাজোলায়** পরিণত হয়। মূল জমিতে বপনের জন্য কৃত্রিম আধার বা নির্দিষ্ট জমিতে বীজন তৈরীর জন্য উপযুক্ত সময়ে ক্রমিক অপসারণ দ্বারা প্রতি বছরে হেক্টর প্রতি 430 টন **য়্যাজোলা** উৎপাদন করা সম্ভব। যদিও কাঁচা **য়্যাজোলার** 90-93% জলীয় অংশ, তবুও বেশ মোটা আস্তরণের **য়্যাজোলা** আবাদ করতে পারলে তা' থেকে হেক্টর প্রতি 30-40 কেজি. নাইট্রোজেন পাওয়া যেতে পারে, কারণ শুষ্ক ওজনের ভিত্তিতে এতে থাকে 4-5% নাইট্রোজেন। **য়্যাজোলা** দ্রুত পচনশীল এবং 8-10 দিনেই গাদা করা অবস্থায় তা' পচা সারে পরিণত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, 335 দিনে **য়্যাজোলা পিন্নাটা'র** 22 বার আবাদ তোলা সম্ভব এবং এ থেকে সহজেই হিসাব করা যায় যে এই ধরনের আবাদে হেক্টর প্রতি মোট 465 কেজি. নাইট্রোজেন অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিনে 1·4 কেজি নাইট্রোজেন পাওয়া

অসম্ভব নয় (এস্‌পিনাস্ ও সহকর্মীবৃন্দ, 1979) যা' প্রায় শুঁটিজাতীয় গোখাদ্যের দ্বারা আরোপিত নাইট্রোজেনের পরিমাণের সমতুল (স্টুয়ার্ট, 1977)। ঋতু-ভিত্তিক ভাবে **য়্যাজোলার** দ্বারা নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণের হারে তারতম্য হয়, জুলাই মাসে তা' থাকে বেশী আর অক্টোবরে সর্বাপেক্ষা কম।

য়্যাজোলার সৃজন-বৃদ্ধির উপরিউক্ত তথ্যের উপর মূলতঃ ভিত্তি করে ভারতের কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্র যে কর্মসূচী দিয়েছেন তা' হল—

1। 12 বর্গমিটার জমির জন্য 4 কেজি. **য়্যাজোলার** সঙ্গে 36 গ্রাম সুপারফস্‌ফেট ও 4 গ্রাম ফুরাডান্ মিশিয়ে বপন করে এক সপ্তাহ রাখা।

2। 30 বর্গমিটার পরিসর জমিতে 12 কেজি. **য়্যাজোলার** সঙ্গে 90 গ্রাম সুপারফসফেট্ ও ১২ গ্রাম ফুরাডান মিশিয়ে বপন।

3। 100 বর্গমিটার পরিসর এলাকায় 36 কেজি. **য়্যাজোলার** সঙ্গে 300 গ্রাম সুপারফসফেট্ ও 36 গ্রাম ফুরাডান মিশিয়ে বপন।

4। 300 বর্গমিটারের জন্য 110 কেজি. **য়্যাজোলার** সঙ্গে 900 গ্রাম সুপারফস্‌ফেট্ ও 110 গ্রাম ফুরাডান।

5। 900 বর্গমিটার জমির জন্য 330 কেজি. **য়্যাজোলার** সঙ্গে তিন কেজি সুপারফস্‌ফেট ও 330 গ্রাম ফুরাডান মিশিয়ে বপন।

6। এক একর থেকে এক হেক্টর পরিসর জমিতে 1000 কেজি. **য়্যাজোলা** বপন করতে হবে। তবে বড় জমিতে বপন করার সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা, যথা জোরে বাতাস, বা অধিক বৃষ্টিপাতের কথা মনে রেখে 300-400 বর্গমিটার পরিসরের ছোট ছোট কোঠায় ভাগ করে নেওয়া অভিপ্রেত। আরও মনে রাখা দরকার যে অন্যান্য ফসলের মত **য়্যাজোলা** প্রায়ই নানা কীট শত্রুর আক্রমণে বিনষ্ট হ'তে পারে। কাজেই, প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফুরাডান প্রয়োগ প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে।

২. ১০. য়্যাজোলার বপন ও ব্যবহার :—
(Azolla inoculation and utilization) :—

য়্যাজোলা মূলতঃ জলজ ফার্ন-জাতীয় হওয়ায় এর জীবন নির্বাহের জন্য জল অপরিহার্য। পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে **য়্যাজোলার** অভিপ্রেত বৃদ্ধি পেতে হলে মূল সারগুলির মধ্যে ফস্‌ফেট্ সংযোজন দরকার এবং কীটের উপদ্রব প্রতিহত করার জন্য ফুরাডানও প্রয়োগ করা দরকার। বিভিন্ন

পরিস্থিতিতে **য়্যাজোলার** ব্যবহার নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করা যায় :—

1. জমিতে জল পুরোপুরি আবদ্ধ থাকলে মূল জমিতে নির্দিষ্ট হারে সরাসরি **য়্যাজোলার** আবাদ করা যেতে পারে। জমিটি এই ফার্নের একটি আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে গেলে তা' লাঙ্গল দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। জমিতে যদি আংশিক পরিসরে জমা জল থাকে তাহ'লে ঐ পরিসরের এলাকার অনুপাতে প্রয়োজনীয় **য়্যাজোলার** বীজের বপন করতে হবে ও এক সপ্তাহ পরে তা' তু'লে জমির শুষ্ক এলাকায় ছড়িয়ে দিতে হবে। এক সপ্তাহ পরে ঐ জলা এলাকা থেকে **য়্যাজোলা** তোলার সময়ে সেখানে কিছু বীজন ছেড়ে রাখতে হবে তা' থেকে আবার এর আবাদ তোলার জন্য। জমির অন্যত্র ছড়িয়ে দেওয়া **য়্যাজোলা** 8-10 দিনে পচে সারে পরিণত হবে। এই ভাবে জমির 5-10% পরিসর এলাকায় জল থাকলে সেখান থেকে পুরো জমির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ **য়্যাজোলা** 2-3 মাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

2. ধান রোপনের আগে প্রয়োজনীয় ব্যবধানের সময়ে জমিতে জল পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। এই ধরনের জমিতে **য়্যাজেলা** থেকে সুফল পেতে হ'লে ধান রোপনের এক সপ্তাহ পর **য়্যাজোলা** বপন করতে হবে এবং বপন করার সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুপারফস্‌ফেট্‌ সার ও ফুরাডান কীটঘ্ন বীজনের সাথেই প্রয়োগ করতে হ'বে। সঠিক পরিমাণ বীজন বপন করলে 20-40 দিনেই জমিতে **য়্যাজোলার** একটি আস্তরণ তৈরী হবে। সেই সময় জমির জল অপসারণ করে যান্ত্রিক নিড়ানীর সাহায্যে তা' জমির মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং তাতে **য়্যাজোলা** স্বাভাবিকভাবে পচে যাবে। এইভাবে **য়্যাজোলা** ব্যবহারে আগাছার উপদ্রবও দমন করা যায়।

3. সদ্য **য়্যাজোলা** বা **য়্যাজোলা**-পচা-সার ধানের পাশকাঠি ছাড়ার পর্যায়ে চাপান সার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়।

4. অগভীর পুষ্করিণী, গর্ত বা জলা জমিতে **য়্যাজোলার** সৃজন-বর্ধন করা যেতে পারে যা' ক্রমিকভাবে ধান জমিতে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া সম্ভব হ'লে পাকা চৌবাচ্চাকে সারা বছর **য়্যাজোলা** উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে চৌবাচ্চার আয়তন হ'তে হবে 50-100 বর্গমিটার ও প্রায় 60 সেমি. গভীর। এই মাপের চৌবাচ্চার তলায় মাটির একটি আস্তরণ ও প্রয়োজনীয় গভীরতার জল দিয়ে **য়্যাজোলা** আবাদের আদর্শ আধার তৈরী করা যেতে পারে।

২.১১. য়্যাজোলা ধানের দ্বৈত আবাদ :—
(Dual Cropping) :—

ধান চাষের সঙ্গেই **য়্যাজোলার** আবাদ করা যেতে পারে, তা'র কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। সাধারণ ভাবে সাথী ফসলের ন্যায়ই ধানের সঙ্গে **য়্যাজোলার** চাষ করে অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে **য়্যাজোলাকে** ঠিক সাথী ফসল হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না, কারণ **য়্যাজোলা** থেকে সরাসরি আমাদের ব্যবহারোপযোগী কোনও ফসল আমরা তুলি না। এর চাষ করা হয় আমাদের প্রধান ফসল ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। **য়্যাজোলাকে** সাথী ফসল হিসাবে ধানের সঙ্গে চাষ করে ধানের যে অতিরিক্ত উৎপাদন, মোটামুটিভাবে একই চাষের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তাই হ'ল **য়্যাজোলা** থেকে পাওয়া ফসল। এর আরও বিশেষ অবদান হ'ল মাটির প্রকৃতিকে সঠিক ভাবে রাখতে সাহায্য করা, কারণ অজৈব রাসায়নিক সারের একক ব্যবহারে মাটি যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারায় **য়্যাজোলায়** তা' হবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। এর অর্থনৈতিক অভিপ্রেত দিকগুলিকে এর সাথে বিবেচনা করলে দেখা যাবে চাষ-আবাদে এর অবদান বহুমুখী।

ধান-চারা রোপনের কিছুদিন পরে চারাগুলি ঠিকভাবে লেগে যাবার পর জলপূর্ণ বাঁধ দেওয়া জমিতে প্রতি বর্গমিটারে 0'1 কেজি. হিসাবে **য়্যাজোলা** বপন করলে 20-30 দিন পরে তা' পুরো জমির জলের উপর একটা মোটা আবরণের সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ ধান চাষে পদ্ধতিগত ভাবে চারা রোপন করার এক দেড় মাস পরে নিড়ানো হয় বা মাটি ঘেঁটে দেওয়া হয়। ধান ও **য়্যাজোলার** দ্বৈত চাষেও ঐ একই চাষ প্রক্রিয়ায় **য়্যাজোলাকে** মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দ্বৈত চাষের ফলে, **য়্যাজোলা**, আগাছার দমন বহুলাংশে করে ঠিকই, তথাপি ঐ সময়ে একবার মাটি ঘেঁটে দেওয়াও ধান চাষের একটি পদ্ধতিগত প্রয়োজন। কাজেই **য়্যাজোলার** আস্তরণ তৈরী হবার পর জমির জল সরিয়ে দিয়ে সারিতে রোপন করা ধানের ক্ষেত্রে জাপানী যান্ত্রিক নিড়ানীর সাহায্যে **য়্যাজোলাকে** মাটিতে মিশিয়ে দিলে নিড়ানোর কাজ এবং **য়্যাজোলার** সঠিক ব্যবহার একই সাথে করা যায়। মাটিতে **য়্যাজোলা** মিশিয়ে দেবার পর ধানের ঘন সবুজ রঙ হওয়া, গাছের বৃদ্ধি দ্রুততর হওয়া ও ধানের ফুলন্ত অবস্থা ত্বরান্বিত হওয়া যে **য়্যাজোলারই** অবদান তা বুঝতে অসুবিধা হয় না এবং হেক্টর প্রতি 0'4 টন অতিরিক্ত ফলন হ'ল

এর আকাঙ্খিত অবদান। **য়্যাজোলার** উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতার পদ্ধতিগত দিকটি এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। কাজেই আংশিকভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার, ধানের সঙ্গে **য়্যাজোলার** দ্বৈত আবাদে, এখনও করতে হবে। অজৈব রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের ব্যবহারকে ধানের বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করতে হ'বে। প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে ধানে তাৎক্ষণিকভাবে ফসলের ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয়। তাই মূল সার হিসাবে অজৈব নাইট্রোজেন প্রয়োগ ও পরে দ্বৈত আবাদে **য়্যাজোলা** আবদ্ধীকৃত নাইট্রোজেনকে চাপান সার হিসাবে ব্যবহার করলে অনেক বেশী ফল লাভ করা যায় (সিং, 1979)। সেক্ষেত্রে কেবল **য়্যাজোলাকে** চাপান সার হিসাবে ব্যবহার করে হেক্টর প্রতি 5-10 টন তাজা **য়্যাজোলা** প্রয়োগে 13-33% বেশী ফলন পাওয়া যায়।

ধান-**য়্যাজোলার** দ্বৈত আবাদের ক্ষেত্রে ভারতে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে উক্ত পদ্ধতিকে আরও উন্নত করে অধিকতর ফললাভ করা সম্ভব। কারণ, চীনের বিভিন্ন পরীক্ষার তথ্য থেকে জানা যায়, ঘন জোড়-সারিতে রোপন করা ধানে **য়্যাজোলাকে** দ্বৈত আবাদী হিসাবে প্রয়োগে আরও অধিকতর উপকার পাওয়া গেছে (লিউ চুং চু, 1979)। এই পদ্ধতিতে জোড়-সারির চারাগুলির মধ্যে সারির দূরত্ব হবে 13·2 সেমি., সারির মধ্যে গোছাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব হবে 6·6 সেমি., দুটি জোড়-সারির মধ্যে পার্থক্য থাকবে 53-66 সেমি.। খাটো জাতের ধানের ক্ষেত্রে দু'টি জোড়-সারির মধ্যে দূরত্ব 50 সেমি. অনায়াসে করা যেতে পারে। দুইটি জোড়-সারির মধ্যবর্তী এই চওড়া জায়গায় **য়্যাজোলাকে** "সাথী" ফসল হিসাবে আবাদ করে অনেক বেশী **য়্যাজোলা** অর্থাৎ প্রতি মরসুমে বছর প্রতি 54·5 টন তাজা **য়্যাজোলা** এক হেক্টরে পাওয়া যায় ও তার ফলস্বরূপ প্রতি মরসুমে হেক্টরে 6·52 টন ধান পাওয়া সম্ভব। এইভাবে, একাদিক্রমে নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ধানের আবাদে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না বরং অনেক বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে যে হেক্টর প্রতি 75 টন তাজা **য়্যাজোলা** জমিতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন সার আরোপ করতে পারে তা' 7·5 টন ধান উৎপাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত। এই পদ্ধতির সার্থক ফল পেতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে :—

1. জোড়-সারির মধ্যে দূরত্ব সঠিক রাখতে হবে।

2. সঠিক ও যথাযথ সার প্রয়োগ করতে হ'বে ধান ও **য়্যাজোলা** উভয়ের জন্যই।
3. জমিতে সঠিকভাবে জল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
4. কীট শত্রুর সময়োপযোগী দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুরূপভাবে, আমেরিকায় বিভিন্ন পরীক্ষার তথ্য থেকে জানা যায়, ধান ও **য়্যাজোলার** দ্বৈত আবাদ ধানের ফলন বাড়াবার পক্ষে খুবই অনুকূল। এক্ষেত্রে **য়্যাজোলা মেক্সিকানা,** অন্য প্রজাতি **ফিলিকুলয়ডিসের** চেয়ে তিন গুণ অধিক কার্যকরী। নাইট্রোজেন আরোপের হার বেশী হয় শীতকালীন আবাদে। এই পদ্ধতিতে ধানচাষে যে ফলন পাওয়া যায় তা' হেক্টর প্রতি 90 কেজি. নাইট্রোজেন, য়্যামোনিয়াম্ সালফেট্ হিসাবে প্রয়োগের সঙ্গে তুল্যমানের। দ্বৈত আবাদের ফলে প্রায় 25% বেশী পাওয়া গেছে যা' হেক্টরে 10 কেজি. নাইট্রোজেন হিসাবে য়্যামোনিয়াম্ সালফেট্ প্রয়োগের সমান (রেন্স্ ও ট্যালী, 1978 ; ট্যালী ও রেন্স্, 1979)।

ধানের উৎপাদন বিচারে, অর্থনৈতিক এবং ব্যবহারিক নানা দিকের কথা চিন্তা করে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ধান-**য়্যাজোলার** দ্বৈত আবাদ পদ্ধতিগত দিক থেকে ধান্যোৎপাদনের পক্ষে একটি মূল্যবান পদক্ষেপ। কিন্তু ভারতবর্ষের কৃষি পদ্ধতির সামগ্রিক বিচারে ও কৃষক সাধারণের চেতনাগত দিকের কথা বিচার করে এই পদ্ধতি অবলম্বনকে জনপ্রিয় করতে আরও অনেক বেশী সম্প্রচার দরকার। সারিতে ধানচাষ পরিমাণগত দিক থেকে নগণ্য। এই পদ্ধতি, বিশেষ করে চীনের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করতে হ'লে সঠিক মাপে সারিতে চাষ করে য়্যাজোলার স্বকীয় উৎপাদনশীলতা বাড়াবার চেষ্টায় ব্রতী হতে হ'বে। তারও আগে আমাদের দেশের পরিবেশ বিবেচনা করে ধানের জাতভিত্তিক ও ঋতুভিত্তিকভাবে জোড়-সারির অন্তবর্তী দূরত্ব ও দু'টি জোড়-সারির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বনে কেবল জমিতে জৈব-পদ্ধতি-প্রাপ্ত নাইট্রোজেন আরোপের সুবিধাই হ'বে না, যান্ত্রিক নিড়ানীর ব্যবহার দ্বারা মজুরীদামজনিত ব্যয়ও হ্রাস করা যাবে।

2. 12. সম্বৎসর আবাদে য়্যাজোলার বৃদ্ধির তারতম্য :—
(Year round growth of Azolla) :—

বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে **য়্যাজোলারও** বিভিন্ন প্রজাতি ও জাতের

বৃদ্ধিগত তারতম্য ঘটে। যে কোন জীবেই এই প্রাকৃতিক প্রভাব খুবই স্বাভাবিক। যা' হোক, এই কারণেই **য়্যাজোলা** বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং প্রজাতি ও জাত অনুসারে প্রভাবিত হ'বার ধারাও বিভিন্ন হয়। প্রজাতি ও তা'দের জাতের বৃদ্ধি ও বাৎসরিক উৎপাদনশীলতা লক্ষ্যণীয়ভাবে কম-বেশী হয়।

বিকল (Bicol) প্রাপ্ত **য়্যাজোলা পিন্নাটার** জাতটি 335 দিনে 22 বার আবাদ করা যেতে পারে (ওয়াতানাবে, 1980)। ম্যানিলাস্থ আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে তা' হেক্টরে 465 টন ওজন সজীব পদার্থ উৎপাদন করে ; যা'র প্রাত্যহিক নাইট্রোজেন আরোপের হার হ'ল 1·4 কেজি.। এই পরিমাণ গোখাদ্য শুঁটি জাতীয় শস্যের দ্বারা আরোপিত নাইট্রোজেনের সঙ্গে তুলনীয় (স্টুয়ার্ট, 1977)। প্রতি আবাদে আরোপিত নাইট্রোজেনের পরিমাণের ক্রমিক পরিসংখ্যানের তুলনা করলে দেখা যায় যে তাতে পরিমাণগত বেশ তারতম্য থাকে। জুলাই মাসে তোলা আবাদের এই পরিমাণ হয় সর্বাধিক ও অক্টোবরে সর্বনিম্ন। প্রাকৃতিক পরিবেশে এই **য়্যাজোলার** শুষ্ক ওজনের পরিমাণ হেক্টর প্রতি 8 টন ; কিন্তু ছায়াচ্ছন্ন অবস্থায় এই পরিমাণ কমে দাঁড়ায় তিন টনে। ভারতবর্ষে সপ্তাহান্তিক আবাদ তোলার ভিত্তিতে বৎসরে হেক্টর প্রতি 800 কেজি. নাইট্রোজেন পাওয়া গেছে (সিং, 1979)। এখানেও ঋতুভিত্তিক পরিমাণগত পার্থক্য দেখা গেছে। বিভিন্ন নৈসর্গিক কারণগুলির বিচার বিবেচনায় দেখা যায়, **য়্যাজোলা** উৎপাদনের এই ঋতুভিত্তিক তারতম্যের কারণ কেবলমাত্র তাপমাত্রা বা সূর্যালোক প্রখরতাই নয় যেহেতু ম্যানিলার জলবায়ুতে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারীতে কম **য়্যাজোলা** উৎপাদন প্রমাণ করে অধিক তাপমাত্রাই উৎপাদন হ্রাসের হেতু নয়, কারণ এই সময়টি শীতকাল। পরিবেশের অন্যান্য কারণ যথা—কীট শত্রুর উপদ্রব, অন্য সবুজ শ্যাওলার প্রাধান্য ইত্যাদিও **য়্যাজোলার** উৎপাদন ব্যাহত করতে পারে।

অনাচ্ছাদিত জমিতে চারটি বিভিন্ন ঋতুতে **য়্যাজোলার** 8টি বিভিন্ন প্রজাতি ও জাত ম্যানিলাস্থ আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের জলবায়ুতে বিভিন্ন ধরনের বৃদ্ধিগত পার্থক্য দেখায় (সারণী-2)।

সারণী-2. বিভিন্ন **য়্যাজোলা** প্রজাতি ও জাতের অনাচ্ছাদিত অবস্থায় সর্বোচ্চ জৈব-উপাদানের পরিমাণ।

(এস্‌পিনাস্ ও সহকর্মীবৃন্দের 1979 এর তথ্যের ভিত্তিতে)

প্রজাতি	জাত	তাজা ওজনের পরিমাণ (গ্রাম / মি.^{2})			
		মে-জুন	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী	এপ্রিল-মে
য়্যাজোলা পিন্নাটা	বানাউয়ে	1020	1517	1399	863
	বিকল	1591	1577	1405	987
	ব্যাংকক	1799	2378	1926	1384
	মালয়েশিয়া	1628	1940	1265	977
	বোগোর	1233	1695	1363	1075
য়্যাঃ ফিলিকুলয়ডিস্	হাওয়াই	839	—	857	231
	ক্যালফোর্নিয়া	—	—	596	187
য়্যাঃ মেক্সিকানা	ক্যালফোর্নিয়া	—	506	696	501
আবহাওয়া তথ্য (৬ সপ্তাহের গড় হিসাব) ঃ—					
সূর্যকিরণ (cal gm^{-2} m^{-1})		454	395	418	512
বাতাসের তাপ (°c)					
	সর্বোচ্চ	31·8	30·9	28·8	32·3
	সর্বনিম্ন	24·3	20·2	21·6	23·9
সূর্যালোক ব্যাপ্তিকাল (ঘণ্টা)		5·6	4·3	7·2	8·2
বৃষ্টিপাত (মিমি.)		4·6	18·1	0·2	8·6

সাধারণভাবে, **য়্যাজোলা পিন্নাটার** জৈব উপাদান উৎপাদনের পরিমাণ অন্য দু'টি প্রজাতি, যথা, **ফিলিকুলয়ডিস্** ও **মেক্সিকানার** তুলনায় লক্ষ্যণীয় ভাবে অনেক বেশী। **পিন্নাটা'র** বিভিন্ন আঞ্চলিক জাতগুলির মধ্যে ব্যাংকক জাতটি সব সময়েই অন্যান্য জাত অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ তাজা জৈব উপাদান

তৈরী করতে পারে, এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের স্বল্পকাল স্থায়ী সূর্যালোকের পরিবেশে তুলনামূলকভাবে বেশী জৈব উপাদান উৎপন্ন হয় ও এই সময়ে 22-28°c বাতাসের তাপে সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল। **য়্যাজোলার** বৃদ্ধি নিরবচ্ছিন্ন নয়। দৈহিক বৃদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ জৈব উপাদানের পরিমাণ শীর্ষে উপনীত হ'বার পর ও বার্দ্ধক্যজনিত ক্ষয়প্রাপ্তির

সারণী—3। বিভিন্ন **য়্যাজোলা** প্রজাতি ও জাতের জীবনের প্রথম দু' সপ্তাহে বৃদ্ধির হার (অনাচ্ছাদিত অবস্থায়)।

য়্যাজোলার প্রজাতি	জাত	বিভিন্ন মাসে বৃদ্ধি দ্বিগুণিত হ'বার সময় (দিন)			
		মে-জুন	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী	এপ্রিল-মে
য়্যাজোলা পিন্নাটা	বানাউয়ে	5·4	4·0	4·8	6·9
	বিকল	4·8	4·2	5·0	6·9
	ব্যাংকক	3·6	3·8	4·9	4·8
	মালয়েশিয়া	5.3	4·2	4·6	5·4
	বোগোর	3·9	3·9	4·2	5·9
য়্যাঃ ফিলিকুলয়ডিস্	হাওয়াই	19·1	—	5·0	14 5
	ক্যালফোর্নিয়া	—	—	7·2	15·5
য়্যাঃ মেক্সিকানা	ক্যালফোর্নিয়া	—	6·6	6·8	7 0

ঠিক পূর্বে এই জলজ ফার্ন জনন পর্যায়ে পরিণতি লাভ করে। **য়্যাজোলা পিন্নাটার** ব্যাংকক ও বিকল জাত দু'টির সম্পর্কে অনুরূপ তথ্য প্রকাশ করেছিলেন বহুপূর্বে (1930 সালে) গুয়েন-কং-থিক (Nguen-cong-thick) ও ইদানীংকালে বেকিং (Becking, 1978)।

সব প্রজাতি ও জাতগুলির প্রাথমিক বৃদ্ধি, তাদের মোট দৈহিক উপাদান প্রস্তুত ও নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণের সহিত একই হারে তুলনীয় হয় (সারণী-3)। তবে **য়্যাজোলা পিন্নাটার** জাতগুলিতে শারীরিক বৃদ্ধি দ্বিগুণ হ'তে সময় লাগে সবচেয়ে কম (সারণী-3)। এ ব্যাপারে **য়্যাজোলা পিন্নাটার** ব্যাংকক জাত যেমন শারীরিক বৃদ্ধিতে বা জৈব উপাদান সৃজনে সবচেয়ে ভাল, তেমনই অনুরূপভাবে এর প্রাথমিক পর্যায়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধির জন্য সময়ও লাগে সবচেয়ে কম এবং নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ ক্ষমতাও এর সবচেয়ে বেশী।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে ধানের সঙ্গে **য়্যাজোলার** দ্বৈত আবাদ কেবল করাই সম্ভব নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে এতে চাষের খরচ কমানো যায়। ধান-**য়্যাজোলার** দ্বৈত আবাদ সেই সব অঞ্চলে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যেখানে ধান চাষের জন্য জমি খুবই সীমিত এবং সেই সঙ্গে **য়্যাজোলার** আবাদের জন্য পৃথক জমি নির্দিষ্ট করাও যেখানে সম্ভব নয়।

ধান ও **য়্যাজোলার** দ্বৈত আবাদের আলোচনার সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, চীনে পরীক্ষিত ঘন জোড়-সারিতে ধান রোপন ও জোড়-সারির দূরত্ব বেশী রাখায় **য়্যাজোলার** দ্বৈত চাষে অধিকতর উপকার পাওয়া যায়। কারণ, ধানের বৃদ্ধির পাশকাঠি ছাড়ার শেষ দিকে সাধারণভাবে রোপণ করা ধানের তলদেশ সূর্যালোক-বঞ্চিত হয় বহুল পরিমাণে। **য়্যাজোলা** ধান জমিতে আবদ্ধ জলের উপরই জন্মায়। ফলে যে সময়ে পতিত সূর্যালোক এর উপর পড়তে বাধা পায় সেই সময়ে এর বৃদ্ধি কম হয়। কৃত্রিম উপায়ে ছায়া সৃষ্টি করে **য়্যাজোলাকে** সূর্যালোক ব্যবহারে বাধা দিয়ে পরীক্ষার দ্বারা এই একই তথ্য পাওয়া গেছে এবং এক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রজাতি ও জাতের প্রতিক্রিয়া পৃথক হয় (সারণী—4-ও 5)। **য়্যাজোলার** বৃদ্ধিতে সূর্যালোকের এই প্রভাব আরও প্রকট হয় যে ঋতুতে সূর্যকিরণের প্রখরতা কম থাকে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী)। মে-জুন মাসের বর্ষা শুরু হওয়া অবস্থাতেও **য়্যাজোলা পিন্নাটার** বিকল জাত ও **য়্যাঃ ফিলিকুলয়ডিসের** হাওয়াই জাত এই কৃত্রিম ছায়ায়িত অবস্থায়, পরিসংখ্যান তাত্ত্বিক বিচারে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়ভাবে পার্থক্য দেখায়।

সারণী—4। অনাচ্ছাদিত অবস্থায় বিভিন্ন **য়্যাজোলার** নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণের পরিমাণ।

য়্যাজোলা প্রজাতি	জাত	প্রতি বর্গমিটারে নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণের পরিমাণ (কেজি.)		
		মে-জুন	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী
য়্যাজোলা পিন্নাটা	বানাউয়ে	31·8	31·8	40·8
	বিকল	38·7	43·6	41·1
	ব্যাংকক	34·2	47·9	46·6
	মালয়েশিয়া	36·5	45·0	39·4
	বোগোর	19·3	42·0	44·4
য়্যাঃ ফিলিকুলয়ডিস্	হাওয়াই	17·4	—	26·5
	ক্যালিফোর্নিয়া	—	—	20·6
য়্যাঃ মেক্সিকানা	ক্যালিফোর্নিয়া	—	11·4	20·4

কিন্তু সূর্যকিরণ ও সূর্যালোকের প্রখরতা যে সময়ে সবচেয়ে বেশী থাকে সেই সময়ে ঐ বিভিন্ন জাত বা প্রজাতির বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়ভাবে তেমন দেখা যায় না।

উল্লিখিত বিভিন্ন পরীক্ষা-পর্যায়ের সাধারণ বিবেচনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে আচ্ছাদিত বা অনাচ্ছাদিত উভয় অবস্থাতেই **য়্যাজোলা পিন্নাটা** প্রজাতির বিভিন্ন আঞ্চলিক জাতগুলি অন্য দু'টি প্রজাতি যথা, **ফিলিকুলয়ডিস্** ও **মেক্সিকানা** অপেক্ষা গুণগত দিকের সবগুলিতেই অনেক ভাল। আবার, **পিন্নাটার** জাতগুলির মধ্যে ব্যাংককই জৈব উপাদান তথা নাইট্রোজেন-আবদ্ধীকরণের ব্যাপারে সব অবস্থাতেই অন্যগুলির তুলনায় ভাল।

সারণী—5। য়্যাজোলার বৃদ্ধিতে 50% ছায়াচ্ছন্ন অবস্থার প্রভাব।

য়্যাজোলার প্রজাতি	জাত	বৃদ্ধি হওয়ার ব্যাপ্তিকাল: মে-জুন	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী	এপ্রিল-মে
য়্যাজোলা পিন্নাটা	বানাউয়ে	—22	—51	—42	—17
	বিকল	—32	—57	—42	—28
	ব্যাংকক	—21	—40	—37	—2
	মালয়েশিয়া	—18	—43	—26	—21
	বোগোর	—11	—50	—39	—17
য়্যাঃ ফিলিকুলয়ডিস্	হাওয়াই	—64	—	—64	+35
	ক্যালিফোর্নিয়া	—	—	—	+8
য়্যাঃ মেক্সিকানা	ক্যালিফোর্নিয়া	—	—36	—	—37

* [পূর্ণ বা স্বাভাবিক সূর্যালোক প্রাপ্ত অনুরূপ পরীক্ষাক্রমের শতকরা হার হিসাবে দেখানো পরিসংখ্যান]।

2.13. শৈত্যমণ্ডলীর অঞ্চলে ধানের পর য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিস্‌কে সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার :—

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহে একই জমিতে একাদিক্রমে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের ক্ষেত্রে **য়্যাজোলার** পর্যায়ক্রমিক প্রয়োগের সুবিধা আছে। পূর্বালোচনায় এ প্রসঙ্গে মোটামুটি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। **য়্যাজোলার** বিভিন্ন

প্রজাতি ও জাতের গুণগত দিক আলোচনায় দেখা গেছে যে সাধারণভাবে কোনও প্রজাতি বা জাত তুলনামূলকভাবে কম নাইট্রোজেন আরোপ করতে পারে বটে তবে অন্যদিক দিয়ে তা' বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। **য়্যাজোলা** *পিন্নাটা* অন্যান্য প্রজাতি অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ করতে পারে ; কিন্তু তা'র শৈত্যসহন ক্ষমতা বা তাপ-সহন ক্ষমতা সীমিত। কাজেই শৈত্য মণ্ডলীয় অঞ্চলে বা শীতপ্রধান দেশের এক ফসলী জমিতে শীতকালের অনাবাদী সময়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির বা জৈব উপাদান সংযোগের একটি সুযোগ থাকে। **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিস্** এমতাবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ এই প্রজাতিটি শীত সহনশীল। কাজেই এখন এই প্রজাতিটির ব্যবহারিক দিকটির বিশ্লেষণ মূলতঃ ট্যালি ও রেইন্স্ (1980)-এর পরীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

1. ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেন্টো উপত্যকায় জানুয়ারী থেকে মে মাসের সময়সীমায় **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিসের** বৃদ্ধি ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাতাসের উচ্চতম তাপের সাথে ধনাত্মক লগারিদমীয় অপেক্ষক নিয়মে সম্পর্কিত। জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের বাতাবরণে **য়্যাজোলার** বৃদ্ধি কম থাকে ও শুষ্ক দেহ উপাদানের মাত্র 3% নাইট্রোজেন থাকে। এই সময়ে গড় তাপমাত্রা থাকে 15°C-এর নীচে। এর পরবর্তী সময় থেকে মার্চের শেষ পর্যন্ত গড় তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় 15°C থেকে 20°C-এ এবং এই সময়ে **য়্যাজোলার** দেহ উপাদান দ্বিগুণিত হবার সময় 10 থেকে কমে 5 দিনে নামে আর নতুন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কলামগুলীতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা 50% বৃদ্ধি পেয়ে হয় 4·5%। **য়্যাজোলার** বৃদ্ধির এই সূচকীয় হার (exponential growth rate) এপ্রিল পর্যন্ত বজায় থাকে এবং এই সময়ে দেহ-উপাদান দ্বিগুণ হবার সময় কমে দাঁড়ায় তিন দিনে।

2. নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষালব্ধ ফলে দেখা যায় যে 24 ঘণ্টায় আলোকিত ও অনালোকিত পর্যায়ের সম অবস্থান কালে 10/1°C থেকে 25/15°C তাপমানে **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিসের** বৃদ্ধি সূচকীয় হারেই হয়। নির্দিষ্ট তাপ তারতম্য সীমার মধ্যে কোয়াণ্টাম শক্তির তারতম্য ঘটালে তা' বৃদ্ধির দিকে থাকলে **য়্যাজোলার** বৃদ্ধি সাধারণ রৈখিক হারেই হয়। কিন্তু খোলা মাঠে আলোক অভিপাতের দৈনন্দিন তারতম্য তেমন লক্ষণীয় থাকে না, বরং তাপমাত্রার তারতম্যই প্রণিধানযোগ্য ভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে এবং

তাপমাত্রাই এই ফার্ন-শৈবালের যৌগ শরীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ অধিকতর করে থাকে।

3. নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আরও জানা গেছে যে প্রতি সেকেণ্ডে এক বর্গমিটারে 50—1,000μE পরিমাণ আলোকের কোন প্রভাবই **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিস্-য়্যানাবিনার** যৌগের নাইট্রোজেনেজের ক্রিয়াশীলতায় থাকে না। কিন্তু তাপমাত্রার তারতম্য এর ক্রিয়াশীলতাকে প্রভাবিত করে এবং 10/1°C থেকে 30/20°C তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেনেজের ক্রিয়াশীলতা সমরৈখিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। **য়্যাজোলার** সাধারণ বৃদ্ধির সাথে আলোক ও তাপের সরাসরি সম্পর্ক বর্তমান। তাপমাত্রার বৃদ্ধির সাথে নাইট্রোজেনেজ ক্রিয়াশীলতার বৃদ্ধি সম্পর্কযুক্ত, এবং নির্দিষ্ট তাপসীমায় কোয়াণ্টাম প্রবহন (Quantum flux) বৃদ্ধিতে কলাভুক্ত নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাসের অনুমান করা যেতে পারে। তথাপি পরীক্ষিত সমস্ত তাপমাত্রা ও আলোক-মাত্রার তারতম্যের সহিত **য়্যাজোলার** সূচকীয় বৃদ্ধি, নাইট্রোজেনেজ্ ক্রিয়াশীলতা বা কলাভুক্ত নাইট্রোজেনের পরিমাণকে সরল অনুবন্ধে (simple correlation) নির্দিষ্ট করা না গেলেও আটদিনের নির্দিষ্ট পরীক্ষার মোট তথ্য থেকে নাইট্রোজেন-আবদ্ধীকরণ ও ইথিলীন উৎপাদনকে একটি সুন্দর পূর্বাভাযদায়ী সম্বন্ধে আরদ্ধ করা যায়। ইহার সূত্রটি নিম্নরূপ :—

$Y = 0{\cdot}0662 + 0{\cdot}0239x$

যেখানে, $y = mgN \times m^{-2}$ (প্রতি বর্গমিটারে mgN)

$x = \mu MC_2H_4 \times m^2$ (প্রতি বর্গমিটারে ইথিলীন)।

$r^2 = 0{\cdot}88$ [অনুবন্ধ সহগের বর্গ]

$n = 21$ [পরীক্ষার সংখ্যা]

4। দিবাভাগের পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্নের তাপমাত্রার তারতম্যে **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিস্‌কে** অভ্যস্ত করায় যে য়্যাসিটিলিন্ বিজারণ (Acetylene reduction) হার পাওয়া যায় তা' 15-30°C তাপসীমায় স্থির তাপমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া **য়্যাজোলার** সহিত প্রায় তুলনীয়। কিন্তু 35-45°C তাপসীমায় ক্ষণস্থায়ী তাপমাত্রা তারতম্যে অধিকতর নাইট্রোজেনেজ ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা যায় এবং ক্ষণস্থায়ী অধিক তাপমাত্রায় অভ্যস্ত করায় এই ক্রিয়াশীলতা আরও প্রকট হয় যদি **য়্যাজোলাকে** পূর্বে উষ্ণ অবস্থায় (30/20°C) চাষ করা হয়ে থাকে। 30°C তাপমাত্রার নীচে **য়্যাজোলা**

য়্যানাবিনা যুগ্মের অভ্যন্তকরণ ক্ষতিপূরণের অনুপস্থিতি **য়্যাজোলার** বৃদ্ধির সাথে তাপমাত্রার এবং নাইট্রোজেনের পরিমাণের সাথে তাপমাত্রার সম্বন্ধের ব্যাপারে উল্লেখ্য ভূমিকা প্রমাণ করে। পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্নে **য়্যাজোলার** উপরিতলের তাপ 25°-30°C থাকলে (এই অবস্থা সর্বাধিক নাইট্রোজেনেজ্ ক্রিয়াশীলতা ও বৃদ্ধির অনুকূল) ও মধ্যাহ্নে এই তাপমাত্রা 30°-40° থাকলে (স্বল্পকালস্থায়ী নাইট্রোজেনেজ্ ক্রিয়াশীলতার অনুকূল) **য়্যাজোলা য়্যানাবিনা** যুগ্মের সর্বাধিক বৃদ্ধি ও নাইট্রোজেন আরোপনের বিষয় সন্দেহাতীতভাবে বলা যেতে পারে। এপ্রিল মাসে **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিসের** দ্রুততম বৃদ্ধি পূর্বোক্ত ঐ পরিবেশ থাকার দরুনই হয়ে থাকে।

বসন্তের শেষের দিকে গ্রীষ্মকালে **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিসের** আবাদে নাইট্রোজেন হ্রাস পাওয়ার কারণ হ'ল তাপ মাত্রা বৃদ্ধির জন্য এর বৃদ্ধিচক্র দ্রুততর হয়, ফলে নাইট্রোজেন-আহরণ-কাল হ্রাস পায়। এই পরিবেশে মিটার প্রতি দেহ উপাদানের শুষ্ক ওজন 60-80 গ্রাম হলে জলের উপর একটি স্তরের আচ্ছাদন পড়ে ও অনতিকাল পরেই বহুস্তরের সৃষ্টি হয় ও স্পোরোকার্প (জননদণ্ড) সৃষ্টি হতে থাকে, নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে ও ফসল বার্ধক্যজনিত ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়। এই অবস্থায় অর্থাৎ স্পোরোকার্প হওয়ার এক সপ্তাহ পর পর্যন্ত দিনে হেক্টর প্রতি 2-3 কেজি. নাইট্রোজেন আবদ্ধীকৃত হতে থাকে। এই প্রজাতির **য়্যাজোলা** বহুস্তর সৃষ্টির পর থেকে 5-20 দিন পরে স্পোরোকার্প সৃষ্টি হতে থাকে, এই সময়সীমাই নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণের পক্ষে একটি মূল্যবান শর্ত।

5। জমির উপরিভাগের 18 সেমি. মাটির সহিত হেক্টর প্রতি 60 কেজি. নাইট্রোজেন পচনশীল **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিস্** দ্বারা প্রয়োগ করে সার না দেওয়া জমির তুলনায় হেক্টর প্রতি 1·6 টন ধান বেশী পাওয়া যায়। বসন্তকালে জমি তৈরীর সময়ে শুষ্ক **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিস্** প্রাপ্ত নাইট্রোজেন হেক্টর প্রতি 40 কেজি. হারে প্রয়োগ করলে 1·2 টন বেশী ধান পাওয়া যায়—যা' সমপরিমাণ য়্যামোনিয়াম্ সালফেট সার দিয়ে যে উৎপাদন পাওয়া যায় তার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু **য়্যাজোলা ফিলিকুলয়ডিস্** শুষ্ক দেহ উপাদান হিসাবে প্রতি 93 কেজি. নাইট্রোজেন প্রয়োগে হেক্টরে 2·6 টন ধান উৎপাদিত হয় যা' সমপরিমাণ নাইট্রোজেন য়্যামোনিয়াম্ সালফেট হিসাবে দিলে উৎপাদিত ধানের পরিমাণের চেয়ে 30% কম। সম্ভবতঃ

য়্যাজোলা থেকে প্রাপ্তব্য নাইট্রোজেন জমিতে ধীরগতিতে ছাড়া পায় ফলে ফসল বৃদ্ধির উপযুক্ত পর্যায়ে এই নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হতে পারে না বা অন্যবিধ কারণে এই নাইট্রোজেন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফসল তা সঠিক পরিমাণে আহরণ করতে ব্যর্থ হয়। দেখা গেছে, হেক্টর প্রতি 160 কেজি. নাইট্রোজেন য়্যামোনিয়াম্ সালফেট হিসাবে প্রয়োগে যে ধান উৎপাদিত হয় তার সমপরিমাণ উৎপাদন **য়্যাজোলা** সার প্রয়োগের দ্বারা পেতে হলে 228 কেজি. **য়্যাজোলা** নাইট্রোজেন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

য়্যাজোলার আবাদে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন ব্যবহারের বিভিন্ন আনুপাতিক সুফল বিচারে এর প্রয়োগ ও আবাদের সহগ হিসাবে গ্রহণের বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সামগ্রিক বিচার-বিবেচনায় সার ও অন্যান্য নানা উপযোগিতা **য়্যাজোলাকে** গ্রহণ করায় যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। শীতকালীন পতিত জমিতে সম্ভাব্য অবস্থায় **য়্যাজোলা** চাষ করলে ও এই চাষে প্রযুক্ত ফস্‌ফরাস্ ও লৌহ জাতীয় সার পরবর্তী মরসুমে ধানচাষে এই সারের প্রয়োগ না করলেও চলে। কারণ হেক্টর প্রতি 93 কেজি. নাইট্রোজেন **য়্যাজোলা** দ্বারা ভালোভাবে আবদ্ধীকরণের জন্য জমিতে 18-27 কেজি ফস্‌ফরাস্ প্রয়োগ করার দরকার হয় এবং পরবর্তী গ্রীষ্ম-মরসুমের ধান চাষে এই ফস্‌ফরাস্ ধানের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে প্রয়োজনীয় পরিমাণেই।

2.14. য়্যাজোলার কীট ও অন্যান্য শত্রু এবং রোগ :

যে কোন সাধারণ ফসলের ন্যায় **য়্যাজোলাও** বিভিন্ন প্রকার কীট শত্রু ও রোগের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আকাঙ্খিত ফসল উৎপাদনে **য়্যাজোলার** ব্যবহারকে ফলদায়ী করতে হ'লে **য়্যাজোলাকেও** কীটশত্রু আক্রমণের থেকে রক্ষা করতে হ'বে ও রোগ দমন করতে হবে।

কীট ও অন্যান্য শত্রু—**য়্যাজোলাকে** দুইটি কীট ও একটি শামুক খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে, ফলে **য়্যাজোলার** বৃদ্ধি কেবল ব্যাহতই হয় না অনেক সময়ে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্টও হতে পারে।

লেপিডপ্‌টেরা বর্গের **নিমফিউলা** (Nymphula) গণভুক্ত একটি প্রজাতি ও ডিপ্‌টেরা বর্গের **কিরোনোমাস্** (Chironomus) গণভুক্ত একটি প্রজাতির কীট **য়্যাজোলার** পাতা খেয়ে বেশ ক্ষতি করে। শামুকের

(Gastropoda) একটি প্রজাতি ও অনুরূপ ক্ষতি করে থাকে। কেবল কীটশত্রুর আক্রমণ থাকলে হেক্টর প্রতি 2·5 কেজি. প্রকৃত রসায়ন হিসাবে কার্বোফুরান নামক কীটঘ্ন ব্যবহার করে এদের দ্বারা ঘটিত ক্ষতিকে প্রতিহত করা যেতে পারে। কিন্তু শামুকের আক্রমণ দমন করতে হ'লে হেক্টর প্রতি 1·25 কেজি. প্রকৃত রসায়ন হিসাবে ফোরেট ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। 1·25 শেষোক্ত কীটঘ্ন কীটশত্রু দমনেও সমভাবেই সমর্থ।

ছত্রাক রোগ : ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের দিকে **য়্যাজোলার** পাতায় ধসা লক্ষণ দেখা যায়। **স্ক্লেরোসিয়াম্ রল্ফ্সি** (Sclerotium rolfsii) নামক ছত্রাক এই ধসা রোগের কারণ হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। জুন-জুলাই মাসে **য়্যাজোলায়** এক ধরণের পচন (rotting) দেখা যায় এবং এই পচন 3-4 দিনেই দ্রুত বিস্তার লাভ করে প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

তৃতীয় অধ্যায়

নীলাভ সবুজ শৈবাল ঃ
Blue Green algae

জীবজগতের স্বাভাবিক নিয়মে যে কোনও বাস্তুর (ecosystem) সামগ্রিক ভারসাম্য ঠিক থাকে তার বিভিন্ন জৈব ও অজৈব উপকরণের পরিমিত ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে। পরজীবিতা, মিথোজীবিতা ও আপাতঃ স্বনির্ভরতা এই আদান-প্রদান পারম্পর্যের কয়েকটি দিক। জীবকুলের মধ্যেই পরজীবিতা ও মিথোজীবিতা যেমন প্রত্যক্ষ পারস্পরিক সম্পর্কের নিদর্শন তেমনই যে কোনও জীবের স্বনির্ভরতা প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষ নির্ভরতারই একটি রূপ। জীবজগতে উদ্ভিদকে স্বনির্ভর জীব বলা হ'লেও বাস্তুর বিভিন্ন উপাদানের উপরই তা' নির্ভর করে যা' আবার অন্য জীবের ক্রিয়াকলাপে নিয়ন্ত্রিত বা রূপান্তরিত হয়ে স্বনির্ভর জীব—উদ্ভিদের জীবনধারণ সম্ভব করে ও 'উৎপাদক' হিসাবে, বাস্তুবিজ্ঞানের ভাষায় পরিচিত হয়। 'কৃষিপরিবেশ' যদিও একটি অকৃত্রিম বাস্তু (Artificial ecosystem বা man-altered ecosystem) তথাপি এই পরিবেশেও এই উৎপাদন-উপকরণের আদান-প্রদান নিরন্তর চলে ও সেখানে এক ধরনের স্থিতাবস্থা বর্তমান থাকে। ধানক্ষেতের বাস্তুতে নীলাভ-সবুজ শৈবাল ঐ বাস্তুরই একটি বিশেষ সবুজ অংশ। এই আপাতঃ স্বনির্ভর নীলাভ সবুজ-শৈবাল ধানের জীবনে ও বৃদ্ধিতে অবশ্যই বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পারস্পরিক জৈব সম্পর্কে অন্বেষণ-বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে এই শৈবাল ধানের বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন মৌল খাদ্য সরবরাহ করে সাহায্য করে। তবে এই সম্পর্ক মিথোজীবিতার সম্পর্ক নয়। নেহাতই শৈবালের জীবন ধারায় ও বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উপজাত পদার্থের প্রাকৃতিক বাস্তুতে সংযোজন বা আরোপনের পরোক্ষ ফল। যে কোনও সবুজ উদ্ভিদ যেমন সালোকসংশ্লেষণ দ্বারা বায়বীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সদ্ব্যবহার করে স্বীয় খাদ্য তৈরী করে থাকে, তেমনই এমন কিছু উদ্ভিদ আবার বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণের বিশেষ গুণসম্পন্ন। **য্যাজোলা** প্রসঙ্গে আলোচনায় দেখা গেছে, এই ফার্নের সাথে

মিথোজীবি উদ্ভিদ **য়্যানাবিনা য়্যাজোলী** বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণের ক্ষমতাসম্পন্ন। এমনই ক্ষমতা কিছু মুক্তজীবি বা স্বনির্ভর উদ্ভিদের আছে—নীলাভ-সবুজ শৈবাল তাদের মধ্যে একটি বিশেষ দল।

এই 'উদ্ভিদসমূহের' ('উদ্ভিদসমূহ' কথাটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ বহু প্রজাতির নীলাভ-সবুজ শৈবাল আছে যা'র বেশ কিছু বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণে ও তা' মাটিতে প্রদানে সক্ষম) গবেষণা অনুসন্ধানে ভারতে পুরোধা বিজ্ঞানী হ'লেন ডঃ পি. কে. দে। পরবর্তীকালে আরো অনেক কৃষি বিজ্ঞানীই এ বিষয়ে গবেষণা করে অনেক নূতনতর তথ্য ও ব্যবহারিক উপযোগিতার বিভিন্ন দিক উন্মোচন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইদানীংকালের কটকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের বিভিন্ন বিজ্ঞানী রয়েছেন যাঁরা হ'লেন পট্টনায়ক (1966) ও সিং (1973, 1974 এবং 1975ক) ইত্যাদি আরো অনেকে। এঁদের গবেষণায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনেক তথ্যই রয়েছে ; কিন্তু দৃষ্টিভংগী নিয়ে বা ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা চিন্তা করে প্রয়োগিক কোন নিদান তেমন নেই।

3.1. বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী নীলাভ-সবুজ শৈবালের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি :—

ধানজমিতে নীলাভ-সবুজ-শৈবালের অবস্থিতি মোটামুটিভাবে সর্বব্যাপ্ত। তবে কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, মাটির প্রকৃতি ও ঋতুভেদে এই 'শৈবাল-সমূহে'র প্রজাতি সংগঠন (Species Composition), বিভিন্ন প্রজাতির আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, প্রজাতি বিশেষের প্রাচুর্যের তারতম্য হয়। যদিও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই শৈবাল-সমূহের সমীক্ষা সমানভাবে হয়নি এবং সব রাজ্যে সমীক্ষাও করা হয়নি তবু বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে আহৃত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে ধান জমির মাটিতে বা জলে একশতটিরও বেশী প্রজাতির শৈবাল পাওয়া যায়। তা'র মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট ও প্রধান কয়েকটি প্রজাতি/গণের ভারতে সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক ব্যাপ্তি দেওয়া হ'ল (সারণী 6)।

সারণী 6। ভারতে প্রাপ্ত কয়েকটি নীলাভ-সবুজ শৈবালের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি ও তুলনামূলক প্রাধান্য।

শৈবালের গণ / প্রজাতি	প্রাপ্তি রাজ্য	তথ্য সূত্র
অলোসিরা ফার্টিলিসিমা **Aulosira fertilissima**	বিহার উত্তরপ্রদেশ* মাদ্রাজ*, কেরল*	সিং (1961), সুন্দর রাও ও সহকর্মীবৃন্দ (1963)
অলোসিরা সিলিন্ড্রোস্পার্মাম- **A. cylindrospermum**	উড়িষ্যা* (কটক)	সিং (1971)
ওয়েস্টিয়েলা প্রজাতি **Aulosira spp.**	উত্তরপ্রদেশ*	ভেংকট্রামন্ (1975)
ওয়েস্টিয়্যালোপ্‌সিস্‌ প্রলিফিকা **Westiellopsis prolifica**	কটক (উড়িষ্যা)	পট্টনায়ক (1966)
ওয়েস্টিয়েল্লা প্রজাতি **Westiella Spp.**	মহারাষ্ট্র*	ভেংকট্রামন্ 1975)
নস্টক প্রজাতি **(Nostoc Spp.)**	কটক (উড়িষ্যা)	সিং (1971)
ম্যাস্টিগোক্ল্যাডাস্‌ **Mastigocladus Spp.**	গুজরাট* তামিলনাড়ু	ভেংকট্রামন্ (1975)
গ্লিওট্রাইকা **Gleotricha Spp.**	কটক (উড়িষ্যা)	সিং (1971)
সিলিন্ড্রোস্পার্মাম্‌ গোরখপুরেন্স্‌ **Cylindrospermum gorakhporese**	উত্তরপ্রদেশ বিহার	সিং (1961)
সিলিন্ড্রোস্পার্মাম্‌ **Cylindrospermum Spp.**	তামিলনাড়ু	ভেংকট্রামন্ (1975)
সাইটোনেমা **Scytonema Spp.**	তামিলনাড়ু	ভেংকট্রামন্ (1975)

শৈবালের গণ / প্রজাতি	প্রাপ্তি রাজ্য	তথ্য সূত্র
য়্যানাবিনা ফার্টিলিসিমা **Anabaena fertilissima**	বিহার উত্তরপ্রদেশ	সিং (1961)
য়্যানাবিনা য়্যামবিগুয়া **Anabaena ambigua**	বিহার উত্তরপ্রদেশ	সিং (1961)
য়্যানাবিনা **Anabaena Spp.**	কটক (উড়িষ্যা) তামিলনাড়ু*	সিং (1971) ভেংকট্রামন্ (1975)
য়্যাফানোথেস্ প্যালিডা **Aphanothece pallida**	কটক (উড়িষ্যা)	সিং (1974)
য়্যাফানোথেস্ **Aphanothece Spp.**	কটক (উড়িষ্যা)	সিং (1971)

অলোসিরা ফার্টিলিসিমা নামক শৈবালটি বিহার, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কেরালায় প্রায় সর্বত্রই বর্তমান ও ধান জমিতে প্রধান শৈবাল হিসাবে বিবেচিত (সিং, 1961 ; সুন্দররাও ও সহকর্মীবৃন্দ, 1963)। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও অন্য কয়েকটি উত্তর ভারতীয় রাজ্যে এই শৈবালটি **য়্যানাবিনা য়্যামবিগুয়া, য়্যানাবিনা ফার্টিলিসিমা** এবং **সিলিণ্ড্রোস্পার্মাম্ গোরখপুরেন্স্** নামক শৈবাল প্রজাতিগুলির সহিত প্রায়শঃই মিশ্রিতভাবে থাকে। এই শৈবালগুলি ধান জমিতে পুরোপুরিভাবে ঘন আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে এবং কেবলমাত্র যেটুকু জায়গায় ধান গাছ থাকে সেই টুকুই মাত্র এই শৈবাল-সমূহের দ্বারা অনধিকৃত থাকে (সিং, 1961)।

উত্তরপ্রদেশের বালিয়া ও গাজীপুর জেলার মাটিতে সমীক্ষা চালিয়ে প্রায় 107টি বিভিন্ন প্রজাতির শৈবালের সন্ধান পাওয়া গেছে যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মিক্সোফাইসী (Myxophycae) গোষ্ঠীর বা নীলাভ-সবুজ শৈবালের দলভুক্ত (মিত্র, 1951 ; পাণ্ডে, 1965 ক, খ)। উড়িষ্যার কটকের ধানজমিতে **ওয়েষ্টিয়্যালোপ্‌সিস্ প্রলিফিকা** (পট্টনায়ক, 1966), **অলোসিরা, সিলিণ্ড্রোস্পার্মাম্, নষ্টক ও য়্যানাবিনা** গণভুক্ত প্রজাতিগুলিকেই প্রধানতঃ নাইট্রোজেন

আবদ্ধকারী শৈবাল হিসাবে সমধিক পাওয়া যায় (সিং, 1971)। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ধানজমির মাটি সমীক্ষায় প্রায় 33% মাটিতে নাইট্রোজেন-আবদ্ধকারী শৈবালের উপস্থিতির কথা জানা গেছে। আবার বিভিন্ন রাজ্যে এই জাতীয় শৈবালের আনুপাতিক প্রাপ্তি হারে বেশ পার্থক্য দেখা যায়, যেমন, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, কাশ্মীরও কেরলে যথাক্রমে 37, 60, 43, 10, 7 ও 9 শতাংশ এই ধরনের নাইট্রোজেন-আবদ্ধকারী শৈবাল পাওয়া যায়। তেমনই স্থান বিশেষে প্রমুখ শৈবালের গণ ও প্রজাতিও ভিন্ন হয়। যথা— উত্তরপ্রদেশে **অলোসিরা**, গুজরাতে **ম্যাষ্টিগোক্লাডাস্**, মহারাষ্ট্রে **ওয়েষ্টিয়েলা**, এবং তামিলনাড়ুর এগারোটি ধান উৎপাদনকারী জেলায় **সিলিণ্ড্রোস্পার্মাম্**, **য়্যানাবিনা**, **সাইটোনেমা** ও **ম্যাষ্টিগোক্লাডাস্** গণভুক্ত প্রজাতিগুলিই প্রধানতঃ নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী শৈবাল (ভেংকট্‌রামন্, 1975)

উড়িষ্যার ধানজমির মাটি ও আবদ্ধ জলে প্রমুখ নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী শৈবাল হিসাবে ভিন্ন গণের প্রজাতি দেখা যায়। মাটিতে এই ধরনের শৈবাল প্রজাতিগুলি **অলোসিরা**, **সিলিণ্ড্রোস্পার্মাম্**, **নষ্টক** ও **য়্যানাবিনা** গণের অন্তর্গত ; কিন্তু জলাবদ্ধ জমিতে **গ্লিওট্রিকা** ও **য়্যাফানোথেস্** গণের প্রজাতিরা মুখ্যতঃ এই প্রজাতিগুলিতে ফাইকোরিথ্রিন রঞ্জক (Phycorythrin) অধিক পরিমাণে থাকে। এই রঞ্জক পদার্থের আধিক্যের সহিত কোষবিমুক্ত নির্যাস অধিক ক্ষরণ সম্পর্কযুক্ত বলে জানা গেছে (সিং, 1973, খ ; 1974 ক, 1977 ক; পট্টনায়ক ও সিং, 1977)। সুতরাং দেখা যায় যে ধানজমির মাটিতে ও আবদ্ধজলে নাইট্রোজেন-আবদ্ধকারী নীলাভ-সবুজ শৈবালের প্রজাতিগত মৌলিক পার্থক্য থাকে। সাধারণ জলের অধিবাসী নীলাভ-সবুজ শৈবালই বেশী সক্রিয়ভাবে বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণে সক্ষম। সুতরাং এই শৈবাল উপজাত নাইট্রোজেন প্রয়োগের মাধ্যমে ধানের বৃদ্ধিতে ক্রিয়াশীল কি পরিমাণ হ'তে পারে তার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে ধান ফসলের জীবনকালে জমির মাটি ও আবদ্ধ জল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা সবিশেষ প্রয়োজন।

32. মাটির প্রকৃতি ও শৈবালের বৃদ্ধি :—

মাটির ভৌত ও রাসায়নিক প্রকৃতি যথা মাটির বিন্যাস (Texture), PH ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ইত্যাদির মধ্যে PH (7·5—7·9) যেমন শৈবালের অবস্থিতি ও প্রাচুর্যের উপর প্রভাব ফেলে তেমনি চাষ পদ্ধতি, মাটির সহজাত

উর্বরতা ও জলীয় অংশের পরিমাণ সমধিক ভাবে শৈবালের প্রাচুর্য নিয়ন্ত্রণ করে (গণজালেস ও গ্যাংলা, 1949)। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার সামান্য ক্ষারীয় জমিতে নীলাভ-সবুজ শৈবালের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। ক্ষারীয় উষর জমিতে (Usar) জলাবদ্ধ অবস্থায় রাখলে নীলাভ-সবুজ শৈবাল সমধিক পরিমাণে জন্মায় ও এরূপ জমি পরবর্তীকালে ধান ও আখ চাষের উপযোগী করে তোলা যায় (সিং, 1950)। জমিতে ফস্‌ফেট সার (দে ও মণ্ডল, 1956) এবং বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম (Exchangeable Calcium) প্রয়োগে নীলাভ-সবুজ শৈবালের বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসাবে কাজ করে (রোজার, 1972)।

জমিতে শৈবাল আরোপণে মাটির ভৌতিক প্রকৃতির তেমন কোনও পরিবর্তন হয় না ; তবে মাটির পুঞ্জীভবন (aggregation) ক্ষমতা উন্নত হ'তে পারে (শংকরম্, 1971)। বাগান জমির (Garden Soil) মাটির পুঞ্জীভবন 35·7—42·8% ও বেলে মাটির পুঞ্জীভবন 57·8—78% পর্যন্ত বৃদ্ধি হ'তে দেখা গেছে (মারাঠে, 1972)।

নীলাভ-সবুজ শৈবালের প্রজাতি ভেদে ও ফসল চাষের পার্থক্যের জন্য মাটিতে নাইট্রোজেন আরোপের পার্থক্য ঘটে। ধানের পুরো মরসুমে **অলোসিরা ফার্টিলিসিমা** একর প্রতি 47·6 পাউণ্ড পর্যন্ত নাইট্রোজেন জমিতে আরোপ করতে পারে এবং **সিলিণ্ড্রোস্পার্মাম্ লাইকেনিফরমি** ভুট্টার জমিতে 75 দিনে একর প্রতি 80 পাউণ্ড পর্যন্ত নাইট্রেজেন আরোপ করতে পারে (সিং, 1961)। শৈবাল আরোপণে উষর জমির নাইট্রোজেনের পরিমাণ 46% বৃদ্ধি হতে পারে। আবার শৈবাল আরোপণের পর জমিতে ফস্‌ফরাস্ ও মলিব্‌ডেনাম্ সার প্রয়োগ করলে একর প্রতি 70 পাউণ্ড নাইট্রোজেন ছয় সপ্তাহে যুক্ত হতে পারে ও ফসল তোলার পরও জমিতে একর প্রতি 12·9 পাউণ্ড নাইট্রোজেন অবশিষ্ট থাকে (দে ও মণ্ডল, 1956)। কিন্তু, দীর্ঘকাল স্থায়ী মাঠের পরীক্ষায় ফসল তোলার পর তেমন অবশিষ্ট নাইট্রোজেন জমিতে পাওয়া যায়নি (আয়ার ও সহকর্মীবৃন্দ, 1972)। ধান ফসলের দ্বারা গৃহীত নাইট্রোজেনের পরিমাণের ভিত্তিতে দেখা, শৈবাল দ্বারা প্রদত্ত নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ'ল, হেক্টর প্রতি 20 কেজি. (সহায়, 1966, শংকরম্, 1957)। তবে 15N নাইট্রোজেন স্থচক (15N as traces) হিসাবে ব্যবহারে দেখা যায়, শৈবাল হেক্টর প্রতি 22·5 কেজি. নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণে সমর্থ ও তা' থেকে ধান মাত্র 4·8 কেজি. গ্রহণ করে থাকে

(নিশিগাকি, 1951 ও 1953)। T tenuis শৈবাল আরোপণে ও তৎসহ ফস্‌ফরাস্ ও মলিব্‌ডেনাম্ সার ব্যবহারে জমিতে 50% জৈব নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায় ও এই বৃদ্ধি জমিতে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের ফলে কোনও ভাবে প্রভাবিত হয় না (চোপরা ও দুবে, 1971)। শৈবাল আরোপণে জমির নাইট্রোজেন বৃদ্ধির সাথে জৈব কার্বনের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় ও দেখা গেছে তিন বছর পর্যন্ত এই অবস্থার কোন অবক্ষয় হয় না (শংকরম্, 1971)। শুধু তাই নয়, উষর জমির জৈব উপাদান, জলধারণ ক্ষমতা ও বিনিময়যোগ্য ক্যাল্‌সিয়াম/সোডিয়াম বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে 68·7%, 34·7% ও 58·3% হারে (সিং, 1961)। নিম্ন কার্বন : নাইট্রোজেন অনুপাত সহ (10 : 1) জৈব পদার্থের পচনের (decomposition) ফলে দ্রুতহারে য়্যামোনিয়া উৎপাদিত হয় যা' উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য বা দ্রুত গ্রহণযোগ্য (ফ্লেচার ও মার্টিন, 1948)। শৈবালের সালোকসংশ্লেষণ ক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত অক্সিজেন দ্বারা বিক্রিয়ার (oxidation) ফলে বিক্রিয়াযোগ্য (oxidisable) পদার্থের, সালফাইডের ও ফেরাস্ লৌহের পরিমাণ জমিতে হ্রাস পায় (সিং, 1961, আয়ার ও সহকর্মীবৃন্দ, 1972) ও জৈব অম্ল নিঃসরণের ফলে জমির আবদ্ধ ফস্‌ফরাস্ উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে থাকে (অরোরা, 1969)।

এই বিক্ষিপ্ত তথ্যের সমাহার নীলাভ-সবুজ শৈবালের ধানের চাষে ব্যবহারের উপযোগীতা সম্বন্ধে কিছু আভাস মাত্র। এই নাইট্রোজেন আরোপকারী মুক্তজীবি শৈবালের ধান চাষে বা অন্যান্য ফসল আবাদে সঠিক অবদান নির্ণয় করতে হলে বিভিন্ন দেশে অবলম্বিত এ্যাসিটিলিন্ বিজারণ পদ্ধতিতে পূর্ণ শস্য মরসুমে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন। নাইট্রোজেন সার সদ্ব্যহারের জন্য ও রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসাবে উদ্ভিদ প্রযুক্ত এই উদ্ভিদখাদ্যের সবিশেষ অন্বেষণ-বিশ্লেষন দ্বিধাহীনভাবে করণীয়।

3.3. হেটেরোসিস্ট সমন্বিত ও হেটেরোসিস্টহীন শৈবালের নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণ :—

(N_2 fixation by heterocystous and non-heterocystous forms) :—

এই আলোচনার শুরুতে "হেটেরোসিস্ট" কথাটির ব্যাখ্যা বা পুনরালোচনা করে নেওয়া সমীচিন। **য়্যাজোলা-য়্যানাবিনা** যুগের আলোচনার সময়ে

হেটেরোসিস্টের কথা একবার বলা হয়েছে কিন্তু তা' ছিল মিথোজীবি সম্পর্কের ভিত্তিতে। মুক্তজীবি (free-living) শৈবালের বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণ ও তা'র ক্ষরণ-নিঃসরণ নির্ভর করে বহুলাংশে হেটেরোসিস্টের অবস্থান ও ঘনত্বের উপর। যদিও হেটেরোসিস্ট বিহীন বেশ কিছু শৈবাল (বিশেষ করে এককোষী শৈবাল) বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণে সমর্থ।

হেটেরোসিস্ট কি?—শৈবাল সূত্রে (algal filament) এক বিশেষ ধরনের বিবর্তিত কোষ যা' বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণে সক্ষম। এই কোষ শৈবাল-সূত্রে সর্বত্র নির্দিষ্ট ব্যবধানে বা সূত্রের দুই প্রান্তে বিশেষ পরম্পরায় অবস্থিত। অন্যান্য দেহকোষে যেমন অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য ফটোসিস্টেম II (Photo System II) থাকে এই কোষে বা হেটেরোসিস্টে তা' থাকে না; কিন্তু ফটোসিস্টেম-I এই কোষে খুব সক্রিয়ভাবে থাকে।

শৈবাল-সূত্রে হেটেরোসিস্টের অনুপস্থিতি বা উপস্থিতি নিরূপণ করে ঐ সূত্রের নাইট্রোজেন-আবদ্ধিকরণ ক্ষমতা। হেটেরোসিস্টের অবর্তমানে শৈবালসূত্র নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণে অক্ষম। সুতরাং অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ দ্বারা শৈবাল-সূত্রে ব্যবহারিক উপযোগিতা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। অবশ্য প্রজাতিভেদে বা একই প্রজাতির শৈবালসূত্রের বয়সের তারতম্যে হেটেরোসিস্টের ঘনত্বে পার্থক্য হতে পারে এবং পার্থক্য 3—25%. পর্যন্ত হতে দেখা যায়। তবে হেটেরোসিস্ট থাকলেই বা ঘনত্ব বেশী হ'লেই যে শৈবালের নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণের পরিমাণ বাড়বে তা' সবসময়ে সত্য নয়। কারণ গবেষণাগারে তৈরী কিছু শৈবালের জাতে (Strain), হেটেরোসিস্টের ঘনত্ব বেশী থাকলেও সকলে আনুপাতিক হারে অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন-আবদ্ধিকরণে অপারগ দেখা গেছে। কারণ বেশ কিছু ক্ষেত্রেই ঐ হেটেরোসিস্টগুলি সুগঠিত হয় না (সিং, 1976 ক, খ)।

জমিতে নাইট্রোজেনের যৌথ উৎস বর্তমান থাকলে শৈবালের হেটেরোসিস্ট গঠন ও নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণ অবদমিত হ'তে পারে। এই অবদমিত হওয়ার পরিমাণ শৈবালের প্রজাতিভেদে পৃথক হয়। বস্তুতঃ, জমিতে স্বল্প পরিমাণ (10-20 ppm) অ্যামোনিয়াম্ ক্লোরাইড্ সার থাকলে তা' নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণ বৃদ্ধিই করে (সিং, 1975 খ, 1976 গ)। এমন কি অ্যামোনিয়াম্ বা নাইট্রেট্ জাতীয় সারের উৎস হতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেনের মধ্যে শেষোক্তটি অধিক পরিমাণে জমিতে থাকলেও নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

করে না। **গ্লিওট্রিচিয়া** (Gloeotrichea) গণের শৈবালের ক্ষেত্রে নাইট্রেট নাইট্রোজেন (200-300 ppm ক্যালসিয়াম্ নাইট্রেট্ সূত্রে প্রাপ্ত) প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘসময় অভ্যস্ত করার পর নাইট্রোজেন-আবদ্ধিকরণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (পট্টনায়ক ও সিং, 1977)। কিন্তু বাস্তবে নাইট্রেট্-নাইট্রোজেনের, ধানজমিতে ব্যবহারের, নিদান দেওয়া হয় না কারণ এই জাতের সার দ্রুতগতিতে অগ্রহণীয় হয়ে যায় ও জলা জায়গায় চুঁইয়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

এ পর্যন্ত যে সব শৈবালের কথা বলা হয়েছে সবগুলিই তাদের শরীরে বিশেষ কোষ বা হেটেরোসিস্টের অবস্থিতির ও পরিমাণগত পার্থক্যের জন্যই বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণের গুণ সমন্বিত হয়েছে। এ ছাড়াও ধান জমিতে **য়্যামানোথেসি প্যালিডা** ও **য়্যাঃ ক্যাষ্টাজেনী** নামক দুইটি এককোষী শৈবাল কটকে প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে এবং এগুলি নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন (সিং, 1973 খ, 1974 ক, 1977 ক) সুতরাং হেটেরোসিস্টের অবস্থিতিই সব ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণের আবশ্যিক শর্ত নয়।

জীবাণুর জীন-তাত্বিক (genetic) বিভিন্ন প্রকার গবেষণা বেশ ভালভাবেই বিভিন্ন দেশে হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু নীলাভ-সবুজ শৈবালের উপর এই ধরনের গবেষণা তেমন হয়নি। দেখা গেছে, প্রাকৃতিক ভাবেই নীলাভ-সবুজ শৈবালের বিভিন্ন প্রজাতিতে মিউটেশনের ফলে বিভিন্ন জাতের সৃষ্টি প্রায়শঃ হচ্ছে এবং তাদের জীবনধারা বা ক্রিয়ায় নানা ধরনের পার্থক্য থাকছে। যেমন, কোনও জাতের হয়তো বা মূল প্রজাতির তুলনায় কম সংখ্যক হেটেরোসিস্ট, ফলে ঐ জাতটির নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণের ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম হয়। গবেষণাগারেও রাসায়নিক মিউটাজেন প্রয়োগের দ্বারা অনুরূপ জাত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। ইদানিংকালে, **নষ্টক মাস্কোরাম** (Nostoc muscorum) নামক নীলাভ-সবুজ শৈবালে নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণে নির্দিষ্ট জীন (nitrogen fixing gene বা nif gene) কৃত্রিমভাবে আরোপ করা সম্ভব হয়েছে (স্টুয়ার্ট ও সিং, 1975)। আমাদের স্বকীয় গবেষণায় নিফ্ মিউট্যাণ্ট্ পৃথকীকরণ সম্ভব হয়েছে এবং ভাইরাস-প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য (marker) ও স্ট্রেপ্টোমাইসিন্ অনুপ্রবেশ করিয়ে শৈবালে nif gene আরোপ সম্ভব হয়েছে। কাজেই, এমনই অনেক নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণে অপারগ এককোষী শৈবালে কৃত্রিম উপায়ে nif gene আরোপ করে বা অধিক নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণক্ষম জাত থেকে অনুরূপ জীন নিয়ে তা আরোপ করে নতুন জাতের কৃত্রিম উদ্ভব সম্ভব

ও তা'র প্রয়োগ দ্বারা জমিতে অধিকতর পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রদান করার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল।

34. শৈবালের বৃদ্ধি ও নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণের শর্ত :— (Factors affecting algal growth and N_2-fixation.) :—

ধান জমিতে জন্মানো নীলাভ-সবুজ শৈবাল ধান চাষের নানা পরিচর্যা পদ্ধতির প্রভাবে বৃদ্ধি পায়। যেহেতু এই শৈবাল সমূহ ধান চাষের মূল লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় বা এদের দ্বারা ধান কিভাবে প্রভাবিত হতে পারে সে বিষয়ে তেমন নজর দেওয়া ও হয় না। ধানের পরিচর্যা পদ্ধতি ছাড়াও এই জলজ উদ্ভিদ ধানের ন্যায়ই প্রাকৃতিক অন্যবিধ নানা কারণে প্রভাবিত হয়ে থাকে। সুতরাং জলবায়ু ও শৈবালের নিজস্ব নানা কীটশত্রু ও রোগ এই উদ্ভিদ সমূহের জীবনে নানা ধরনের প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। ধান চাষের পরিচর্যা পদ্ধতি, যেমন জমি চাষ, জল নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি মৌলিক পরিচর্যাগুলির সহিত ধানের বৃদ্ধি সহায়ক হিসাবে সার প্রয়োগ এবং কীটশত্রু ও রোগ দমনের জন্য নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ এবং আগাছা দমনের জন্য বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং প্রাকৃতিক অবস্থার উপর এই কৃত্রিম শর্তগুলিও শৈবালের জীবন ও বৃদ্ধিতে নানা ধরনের প্রভাব রাখতে পারে।

বাতাবরণের অবস্থা : মাটির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছাড়াও জল, তাপ ও আলোক নীলাভ-সবুজ শৈবালের বৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক হিসাবে কাজ করে।

মাটির PH শৈবালের বৃদ্ধিকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। সাধারণভাবে সামান্য অম্ল থেকে সামান্য ক্ষারীয় মাটি (PH 5—11) এই শৈবালের পক্ষে অভিপ্রেত। মাটির জৈব উপাদানের পরিমাণের উপর ও শৈবালের জীবন ও বৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করে। ধান আবাদের জন্য মাটিতে চাষ দেওয়ার ফলে শৈবালের আস্তরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে বৃদ্ধি ব্যহত করে, ফলে নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণের পরিমাণও কমে যায়। অনুরূপভাবে, নিড়ানো, চারা রোপণ ইত্যাদি মূল ফসল পরিচর্যাগুলিও শৈবালের জীবনের পক্ষে অনুকূল নয়।

জমিতে আবদ্ধ জল থাকলে তা' শৈবালের বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। শৈবাল মূলতঃ জলজ উদ্ভিদ হওয়ায় মাটির শুষ্ক অবস্থা শৈবালের পক্ষে অহিতকর, এমনকি দীর্ঘ খরাবস্থায় এই জাতীয় শৈবাল বিনাশের সম্মুখীন হয়। কাজেই জল হল জীবনধারণ, শৈবালের ব্যাপ্তি ও প্রসারের পক্ষে অন্যতম অপরিহার্য শর্ত।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, সাময়িক শুষ্ক অবস্থার পর মাটিকে সামান্য ভিজিয়ে দিলে নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই শৈবালসমূহ সাধারণভাবে 25—45°C তাপসীমায় সক্রিয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে এই তাপসীমার বেশীর দিকেই এদের বৃদ্ধির পক্ষে বেশী অনুকূল; কারণ দেখা যায় যে 30—45°C তাপেই বৃদ্ধির গতি সবচেয়ে আকাঙ্খিত পর্যায়ের বলে দেখা গেছে। সূর্যকরোজ্জ্বল অবস্থায় এই শৈবালের দ্রুত বৃদ্ধি হয় এবং দেখা গেছে মেঘলা দিনে বা ঘন ঘন বৃষ্টি হ'লে বৃদ্ধি যেমন ব্যহত হয় তেমনই নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণও কম হয় (সিং, ১৯৭৬ গ)। ফলে ধান বপন বা রোপণ করা হ'লে সূর্যকিরণ ব্যহত হওয়ায় শৈবালের বৃদ্ধি ও নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ কম হয়।

কীট, রোগনাশক ও আগাছা দমনকারী রসায়নের ব্যবহার ধানের রোগ, কীট শত্রুদমনের বা প্রতিরোধ করার জন্য, প্রায়ই করার প্রয়োজন হয় ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার নিয়মিতভাবেই করা হয়ে থাকে। বহুল পরিমাণে না হ'লেও ধানের আগাছা দমনের জন্যও বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার অনেক দেশে বা অনেক অবস্থায় করা হয়ে থাকে। এই সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে মোটামুটিভাবে কেবল ফসল ও তার শত্রুর কথাই বিশেষভাবে মনে রাখা হয়, পরিবেশের অন্যান্য কিছুর দিকে বা লক্ষ্য বহির্ভূত প্রাণী বা জীবের কথা তেমন চিন্তা করা হয় না। নীলাভ-সবুজ শৈবাল তেমনই একটি লক্ষ্য বহির্ভূত উদ্ভিদ।

কীটঘ্ন রসায়ন আজকাল নানা ধরনের আছে। সবগুলির বিষয়ে তেমন তথ্য জানা নেই এবং সব ধরনের নীলাভ-সবুজ শৈবালের প্রজাতির বিষয়ে ও কীটঘ্নের প্রতিক্রিয়ার তথ্য পাওয়া যায় না। নীলাভ-সবুজ শৈবাল **সিলিণ্ড্রো-স্পার্মাম্, অলোসিরা ফার্টিলিসিমা** এবং নিবাত অবস্থায় নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী **প্লেক্টোনেমা বোরিয়ানাম্** (Plectonema boryanum) কয়েকটি কীটঘ্ন, যথা, বি. এইচ. সি., লিন্‌ডেন্, ডায়াজিনন্ এবং এন্‌ড্রিন্ দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তবে, এর মধ্যে বি. এইচ. সি. ই শৈবালের উপর অধিকতর বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে এবং এই প্রতিক্রিয়াও শৈবালের প্রজাতি ভেদে ভিন্ন হয়। **য়্যানাবিনোপ্‌সিস্ রেসিবোর্স্কি** (Anabaenopsis raciborskii), **য়্যানাবিনা য়্যাফানিজোমেনয়ডিস্** (Anabaena aphanizomenoides), এবং **মাইক্রোসিস্টিস্ ফ্লসুয়্যাকুই** (Microcystis flosaque)-র মধ্যে প্রথম শৈবাল প্রজাতি দুইটি বি. এইচ. সি. দ্বারা অধিকতর

মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমন কি 10 ppm ঘনত্বেও এদের বৃদ্ধি ও নাইট্রোজেন-আবদ্ধিকরণ ক্ষমতা লক্ষ্যণীয়ভাবে ব্যহত হয়। পক্ষান্তরে, কম মাত্রায় ফুরাডান্ (25 ppm) **নষ্টক মাস্কোরাম্** (Nostoc muscorum)-এর বৃদ্ধি ও নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণ ক্ষমতার পক্ষে ক্রিয়া করে। কিন্তু অধিকতর মাত্রায় (50—100 ppm) তা' বৃদ্ধি ব্যাহত করে (কর ও সিং, 1977) কীটঘ্ন ও শৈবালের সম্বন্ধগত আরও একটি আকর্ষণীয় দিক হল এই শৈবাল ক্ষেত্র বিশেষে কীটঘ্নের ক্রিয়াশীলতা বা বিষক্রিয়া হ্রাসে সহায়তা করে। পর্যায়ক্রমে নীলাভ-সবুজ শৈবালের আরোপন ও অপসারণ দ্বারা জলীয় মাধ্যমে বা জলের বি. এইচ্. সি. মাত্রা হ্রাস করা যায় এবং অনুমান করা হয় যে শৈবাল বি. এইচ. সি. বিক্রিয়ায় সহায়তা করে (দাস ও সিং, 1977 খ)।

আগাছা দমনকারী 2,4-D, **য়্যানাবিনোপসিস্ রেসিবোস্কি** ও **মাইক্রোসিস্টিস্ ফ্লস্‌য়্যাকুই** নামক নীলাভ-সবুজ শৈবাল দুইটির উপর ঘনত্বের মাত্রা নির্ভর ভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দর্শায়। সাধারণ মাত্রায় এই আগাছা দমনকারী রসায়নটির তেমন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া এই দুইটি শৈবালের উপর হয় না। বরং কম ঘনত্বে (10—100 ppm) এই শৈবাল দু'টির বৃদ্ধি ও নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণের হার বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। তবে অধিক ঘনত্বে (200—1500 ppm) এদের উপর বিরূপ ক্রিয়া করে। অবশ্য শৈবালের প্রাথমিক সংখ্যা ও সারের পরিমাণের দ্বারা এই ক্রিয়া বিভিন্ন ভাবে প্রতিহত হয় (সিং, 1977 খ)।

ধানের রোগ দমনকারী ঔষধের বিষয়ে তেমন তথ্য জানা নাই। তবে দেখা যায় যে সাধারণ হারে এই সব রসায়ন ব্যবহার করলে, জমির বা শৈবালের পক্ষে সহায়ক সারের পরিমাণ সঠিক থাকলে অথবা শৈবালের সংখ্যাগত ঘনত্ব বেশী থাকলে কীটঘ্ন বা আগাছা দমনকারী রাসায়নিক পদার্থসমূহের বিরূপ ক্রিয়া শৈবালের উপর নাও হ'তে পারে।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ ঃ রাসায়নিক বা অজৈব সার প্রয়োগ আধুনিক কালের ধান চাষে প্রায় অপরিহার্য। স্বাভাবিক জৈব খাদ্যের বিষয়ে উদাসীনতা এই অজৈব সারের ব্যবহারকে আরও প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। এছাড়া তাৎক্ষনিক এবং চমকপ্রদ ফললাভও এই অজৈব সারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। স্বাভাবিক জৈব সারের অন্বেষণ বা তাদের ব্যবহারকে সঠিকভাবে প্রচলিত করার সুনির্দিষ্ট উদ্যোগের যেমন অভাব আছে তেমনই বর্তমান অবস্থায়

উভয়বিধ পদ্ধতির অনুসরণে ফসলের খাদ্যে যোগান দেওয়ার প্রয়োজন হয়তো থাকবে। কারণ যে কোনও একটি পদ্ধতির উপর পূর্ণ নির্ভরতা কোন অবস্থাতেই সম্ভব বা সঠিক নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ধানের ক্ষেতে সহজাত ও স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ হিসাবে নীলাভ-সবুজ শৈবালের উপর ধান চাষের পরিচর্যার অন্যতম পদ্ধতি অজৈব রাসায়নিক সারের প্রয়োগের প্রভাবের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে অধিকমাত্রায় রাসায়নিক সারের প্রয়োগের ফলে নীলাভ-সবুজ শৈবালের বৃদ্ধি, প্রসার এবং নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণ মাত্রা বিঘ্নিত হয়। পক্ষান্তরে, সাধারণ সবুজ শৈবাল অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শেষোক্ত এই শৈবালসমূহ ধানের ক্ষেতে আগাছা হিসাবেই বিবেচিত হয় এবং এদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। দেখা গেছে মূলসার হিসাবে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস্ সার প্রয়োগে এই শৈবাল সমূহ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ধানের চারাকে জড়িয়ে ফেলে এবং চারার বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সুতরাং এমতাবস্থায় মূলসার ব্যবহার পরিহার করাই বাঞ্ছনীয় (সিং, 1973 খ)। নিম্ন মাত্রায় প্রদত্ত য়্যামোনিয়াম্ সালফেট্ (10 ppm), পটাশ (100 ppm), বা ফস্‌ফরাস্ (10 ppm), **য়্যানাবিনা ভ্যারিয়েবিলিস্** (Anabaena Variabilis), **য়্যাঃ নেভিকুলয়ডিস্** (A. naviculoides), **নষ্টক্ কর্‌নীয়াস্** (Nostoc Corneus), **নঃ মাস্কোরাম** (N. muscorum), **নষ্টক্** প্রজাতি (Nostoc spp.), **উল্লিয়া ভরদ্বাজী** (Wollea bharadwajae), **সিলিণ্ড্রোস্পার্মাম্ লাইকেনিফর্মি** (Cylindrospermum licheniformae), **সিঃ স্টাংনেলী** (C. stangnale), **সিলিণ্ড্রোস্পার্মাম্** প্রজাতি (Cylindrospermum spp.) **অলোসিরা ফার্টিলিসিমা** (Aulosira fertilissima) এবং **য়্যাফানোথেসি** প্রজাতি (Aphanothece spp.) ইত্যাদি নীলাভ-সবুজ শৈবালসমূহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না। তবে উক্ত অজৈব সারগুলি যথাক্রমে 100 ppm, 500 ppm ও 100 ppm বা ততোধিক মাত্রায় প্রয়োগ করলে ঐ শৈবালসমূহের বৃদ্ধি ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে ব্যাহত হ'তে থাকে (সিং, 1977 খ)।

শৈবালের স্বাভাবিক শত্রু ঃ অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায় নীলাভ-সবুজ শৈবাল বিভিন্ন ধরনের পরজীবি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই কারণেও নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী নীলাভ-সবুজ শৈবালের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জমিতে নাইট্রোজেন প্রদান ব্যাহত হয়। কীটশত্রু, এককোষী প্রাণী (protozoa),

ছত্রাক (fungi), জীবাণু (bacteria) ও বিষাণু (virsus) প্রভৃতি নানা ধরনের শত্রু শৈবালকে আক্রমণ করে। বিভিন্ন ধানের ক্ষেতে এই শৈবাল সমূহের পরিমাণগত পার্থক্য বা সহসা শৈবালের নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণ এই সমস্ত বিভিন্ন শত্রুর আক্রমণ। কাইট্রিড্ (chitrids) ও **মিক্সোব্যাক্টর সাইটোফ্যাগা** (Myxobacter cytophaga) নামক জীবাণুর আক্রমণ প্রায়শঃই ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

3. 5. নীলাভ-সবুজ শৈবালের স্বজন ও আরোপণ :—
(Production and establishment of inoculum) :—

বীজনের দ্রুত উৎপাদন ও স্বল্প মূল্যতা যে কোনও ফসলের সার্থক ব্যবহার ও প্রসারের প্রাথমিক শর্ত। এই শৈবালের ক্ষেত্রেও ঐ একই সূত্র প্রযোজ্য। বিদেশের বিভিন্ন স্থানে, যথা, জাপান, আমেরিকা, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মানি, রাশিয়া, ইত্যাদি দেশে এই শৈবালের বীজন উৎপাদন শিল্প বা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হয়ে থাকলেও ভারতে তেমন পদ্ধতির প্রচলন এখনও হয়নি।

মোটামুটি উচ্চ তাপ সীমায় অর্থাৎ 35-40°C তাপমাত্রায় কাচ-আচ্ছাদিত আধারে উপযুক্ত খাদ্য মাধ্যমে **অলোসিরা ফার্টিলিসিমা'র** বৃদ্ধি ভালই হয়। খোলা মাঠের ছোট ছোট জমিতেও স্বল্প নাইট্রোজেন সারের মাধ্যমে এই শৈবালের প্রাথমিক প্রজননও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে এইভাবে এদের বৃদ্ধি ও প্রসার অভিপ্রেত হারে হওয়ার বা সঠিকভাবে প্রসারিত হয়ে সারা ক্ষেত আবৃত করার বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধানের জমিতে স্থানীয় অন্যান্য শৈবালই প্রাধান্য বিস্তার করে যা'র অনেক প্রজাতিই নাইট্রোজেন আবদ্ধিকরণ-রহিত, ফলে কৃত্রিমভাবে আরোপিত অভিপ্রেত নীলাভ-সবুজ শৈবাল স্বাভাবিক খোলামাঠে সার্থকভাবে নিজের স্থান করে নিতে সমর্থ হয় না। অনেক সময় ঘন ঘন বৃষ্টিপাতের ফলে শৈবালের সূত্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়ে বা অতি বৃষ্টিপাতে প্রবহমান জলের সঙ্গে ভেসে যাওয়ার জন্য এই শৈবালের বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি ব্যহত হয়। মোটামুটিভাবে অনুমান করা হয়, এই সমস্ত নানা কারণে কৃত্রিম আরোপণ দ্বারা আমাদের দেশে নীলাভ-সবুজ শৈবালের অভিপ্রেত প্রজাতির চাষ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে (সুব্রাহ্মণীয়ন্, 1972)। সুতরাং প্রাথমিক সমীক্ষার দ্বারা দেখে নেওয়া দরকার জমির শৈবাল প্রজাতির স্বাভাবিক সংগঠন কি ধরনের অর্থাৎ

আনুপাতিকভাবে নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রজাতির ঐ শৈবালের সমাজে আধিপত্য বা প্রাধান্য কেমন। এই নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রজাতি সমূহের বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাই কৃত্রিম আরোপন অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ বা বাঞ্ছনীয়। স্থানীয় প্রজাতির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্য সঠিকমাত্রায় চুন, সুপার ফস্‌ফেট্‌ ও মলিবডেনাম্‌ জাতীয় শৈবালের খাদ্যগুলি জমিতে সরবরাহ করা প্রয়োজন।

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত বা স্থানীয়ভাবে প্রযোজ্য শৈবালের প্রজাতি বা জাত, আরোপনের সঠিক সময় বা তা'র সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে পরীক্ষাভিত্তিক তথ্যের যথেষ্ট অভাব আছে। শৈবালের গুঁড়ো করা বীজন (Spore) চুনের সাথে মিশ্রিত করে চাষ দেওয়া জমিতে আরোপন করে (সিং, 1961) বা অন্য ধান জমি থেকে শৈবাল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফস্‌ফরাস্‌ সার ও মলিব্‌ডেনাম্‌ সহযোগে ধান জমিতে আরোপন করে (শংকরম্‌, 1971 ; সুব্রাহ্মণীয়ন্‌, 1972) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন সফলতা লাভ করা যায় নি অথবা সঠিক সময়ে শৈবালের আকাঙ্খিত ব্যাপ্তি ও বৃদ্ধি পাওয়া যায় নি। এতৎ সত্ত্বেও এখানে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অতি বর্ষনে অনেক সময়েই শৈবাল ভেসে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে, সেক্ষেত্রে দেখা গেছে **অলোসিরার** প্রজাতিগুলির দেহসূত্র ধান চারায় জড়িয়ে থাকে ফলে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা এই প্রজাতিগুলিতে কম থাকে। সাধারণভাবে হায়দ্রাবাদের মাটিতে (PH 8·1) এই শৈবালের বৃদ্ধি ভাল হ'তে দেখা গেছে ও ফস্‌ফেট এবং মলিব্‌ডেনাম্‌ যোগ বৃদ্ধির অনুকূল প্রমাণিত হয়েছে (সিং, 1971, 1976 খ)।

3.6. শৈবাল আরোপণ ও ফসল উৎপাদন :—
(Algal inoculation and crop yield) :—

আরোপনের দ্বারা **অলোসিরা** প্রজাতির শৈবাল একটি পূর্ণ আচ্ছাদন সৃষ্টি করলে তা' জমিতে হেক্টর প্রতি প্রায় 52 কেজি. নাইট্রোজেন প্রদান করতে পারে (সিং, 1976 গ)। একাদিক্রমে পাঁচ বছর শৈবাল জমালে জমি থেকে প্রথম তিন বছর তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে অধিক পরিমাণ ধান উৎপাদনে সমর্থ হয় না; তবে, পরবর্তী দু'বছর অধিকতর ফলন পাওয়া যায় (দে ও সুলেমান, 1950)। টবে করা উক্ত পরীক্ষাক্রমের ফল কিন্তু সবক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রতিফলিত হয় না। ভারতে অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার তথ্য থেকে জানা যায় যে, **অলোসিরা**

ফার্টিলিসিমা নামক শৈবালের আরোপনের ফলে প্রায় 368% বেশী উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে যা' স্বাভাবিক ধানক্ষেতে প্রায় 114·8% পর্যন্ত হতে পারে (সিং, 1961)। অন্য পরীক্ষায় (কটকের কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা ক্ষেত্রের) দেখা গেছে যে ঐ শৈবাল টবে 266% বেশী উৎপাদন দিতে সক্ষম (সুন্দর রাও ও সহকর্মীবৃন্দ, 1963) এবং তিন বছর বিরামহীন শৈবাল আবাদে IR 8 জাতের ধান প্রায় 210% বেশী উৎপাদন দিয়ে থাকে (সিং, অপ্রকাশিত গবেষণা তথ্য থেকে)। হেক্টর প্রতি 100 কেজি. চুন, 100 কেজি. সুপার ফসফেট্ ও 0·28 কেজি. সোডিয়াম মলিব্ডেট্ সংযোগ করে আরোপিত শৈবালের দ্বারা ধান উৎপাদন বৃদ্ধিকে অধিকতর সক্রিয় করা সম্ভব হয়। কারণ দেখা গেছে, যে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শৈবাল আরোপণ দ্বারা 18% বেশী উৎপাদন পাওয়া যায় সেই পরিবেশে পূর্বোক্ত সার সমূহের সংযোগের ফলে 82% পর্যন্ত বেশী ধান উৎপাদন করা সম্ভব হয়। মাটির শোধনের পর উক্ত পরিচর্যা সমূহের প্রয়োগে ধান জমি থেকে শস্যোৎপাদন 95% এরও বেশী পাওয়া যায় (রেলওয়ানি ও সুব্রাহ্মনীয়ণ, 1963) এবং এই অতিরিক্ত উৎপাদন হেক্টর প্রতি 20 কেজি. নাইট্রোজেন য়্যামোনিয়াম্ সালফেট হিসাবে দেওয়ার সঙ্গে তুলনীয়। যদিও নীলাভ-সবুজ শৈবাল আরোপণ দ্বারা বিভিন্ন জাতের ধানের উৎপাদনে তেমন লক্ষ্যনীয় পার্থক্য দেখা যায় না (রেলওয়ানি, 1965) তথাপি এই শৈবাল ইউরিয়া সহযোগে আরোপণ করে অধিকতর সুফল লাভ করা যায় (রেলওয়ানি ও মান্না, 1969 ; মাধোলকর ও সহকর্মীবৃন্দ, 1968 ; সুব্রাহ্মনীয়ণ, 1972) এবং শৈবাল আরোপনের স্থায়ী প্রভাব (residual effect) তিন বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে (শংকরণ ও সহকর্মীবৃন্দ, 1967)। বিভিন্ন অঞ্চলের মাটিতে, তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলী ও কটকের বিভিন্ন পরীক্ষায় ও ধান জমির প্রদর্শন ক্ষেত্র-সমূহে নীলাভ-সবুজ শৈবাল আরোপনের উৎসাহব্যঞ্জক ফল লাভ করা গেছে (শংকরণ, 1967)। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর পরীক্ষাক্ষেত্রে নীলাভ-সবুজ শৈবালের T. tenuis প্রজাতিটি কেবল সুপার ফস্ফেট্, সবুজ পাতা ও সুপার ফস্ফেট্ এবং সবুজপাতা, য়্যামোনিয়াম্ সালফেট ও সুপার ফস্ফেট্ সহযোগে আরোপণের তিনটি পরীক্ষাক্রম থেকে শৈবাল আরোপণহীন জমির তুলনায় যথাক্রমে 3·2, 3·3 ও 15·3 শতাংশ বেশী ধানের উৎপাদন পাওয়া গেছে (রেলওয়ানি ও মান্না, 1964)। এছাড়া, আরও দেখা গেছে যে ধান রোপনের একমাস পূর্বে **অলোসিরার** একটি প্রজাতির জমিতে জন্মানোর ফলে 15% অধিক

ফলন পাওয়া যায় (সিং, 1975 গ) এবং বিহারে সাবোরের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে শৈবাল আরোপণ 40% বর্ধিত উৎপাদন প্রদানে সমর্থ এবং স্থপার ফস্‌ফেট্‌ সহযোগে শৈবাল আরোপণ সবুজ সারের সহিত স্থপার ফস্‌ফেট্‌ প্রদানের সাথে তুলনীয় (ঝা ও সহকর্মীবৃন্দ, 1965)।

নীলাভ-সবুজ শৈবাল আরোপণ ও ধানের অতিরিক্ত উৎপাদন লাভ পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে ধানের ক্ষেতে নীলাভ-সবুজ শৈবালের চাষ আবাদের সহযোগী ভূমিকার কথা। এই প্রাকৃতিক সারের উৎসকে, যা ধান জমিতে অনাদরেই জন্মে থাকে তা'র উপযোগিতা সঠিকভাবেই নিরূপণ করে, নির্দিষ্ট ব্যবহারিক নিদান ধান্যোৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

পলিমাটি সমৃদ্ধ ধানজমিতে Aulosira fertilissima, Nostoc muscorum এবং তাদের মিশ্রণ প্রজাতির নীলাভ-সবুজ শেওলা এককভাবে ও মিশ্র প্রয়োগে ধানের শস্য ও খড় উৎপাদন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায় ও মাটিতেও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর সঙ্গে ইউরিয়াজাত নাইট্রোজেন প্রয়োগ বাড়াতে থাকলে নীলাভ-সবুজ শেওলার নাইট্রোজেন আরোপ ক্ষমতা কমতে থাকে এবং জমি শুকনো করলেও তা' কমে যায়, (সাহা ও মণ্ডল, 1980ক)। সবচেয়ে স্থন্দর যে ফলটি পাওয়া যায় এই নীলাভ-সবুজ শেওলা প্রয়োগ করলে তা' হল মাটির ভিতরে বসবাসকারী নানা উপকারী অনুজীবের অনুকুল পরিবেশের সৃষ্টি। নাইট্রোজেন আরোপের সাথে মাটির ভিতরের এই পরিবেশ পরিবর্তন মাটিকে আরও সারবান করতে সাহায্য করা নীলাভ সবুজ শেওলার কৃষিক্ষেত্রে একটি মূল্যবান দান (সাহা ও মণ্ডল, 1980খ)।

সাহা ও তাঁর সহকর্মীদের (1982) পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল থেকে ধান উৎপাদনে ও জমিতে নীলাভ-সবুজ শেওলার, নানা ক্রিয়াশীলতা প্রমানিত হয়েছে। হেক্টর প্রতি কুড়ি টন নীলাভ-সবুজ শেওলা (শুকনো ওজনে যার গ্রাম প্রতি নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ যথাক্রমে 45 মিগ্রা. ও 0·97 মিগ্রা.) প্রয়োগ ধানজমিতে আনে নানা বিদ্যুৎ রাসায়নিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন। বিশেষ করে, তা' দেখা যায় রেডক্স পোটেন্‌সিয়াল এবং প্রাপ্তি (ব্যবহার) যোগ্য নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসের ক্ষেত্রে এবং সম্ভবতঃ এর প্রতিফলন হয় ধানগাছের বৃদ্ধি ও পুষ্টিতে। সারণী-7 থেকে এই সত্যটি অনুমান করা যেতে পারে।

সারণী-7 নীলাভ-সবুজ শেওলা প্রয়োগে প্রাপ্তিযোগ্য নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসের পরিমান (সাহা ও সহকর্মীবৃন্দ, 1982) ।

জল বেঁধে রাখার সময় (দিনের হিসাবে)	গ্রাম প্রতি মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ (mg.)		গ্রাম প্রতি মাটিতে ফস্‌ফরাসের পরিমাণ (mg.)	
	নীলাভ-সবুজ শেওলা বিহীন মাটিতে	নীলাভ সবুজ শেওলা দেওয়া মাটিতে	নীলাভ-সবুজ শেওলা বিহীন মাটিতে	নীলাভ-সবুজ শেওলা দেওয়া মাটিতে
7	5·08	13 28	7·05	7·92
14	8·46	23·59	3·58	3·94
21	7·99	23·58	5·32	13·55
28	14·10	29·79	6·97	14·06
35	10·10	33·02	7·45	10·89

সাহা ও তাঁর সহকর্মীদের (1984) প্রদত্ত তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে ধানজমিতে ফোরেট নামক ফস্‌ফরাস্ ঘটিত দানাদার কীটনাশক প্রয়োগ নীলাভ-সবুজ শেওলার বৃদ্ধিতে ও নাইট্রোজেন আরোপে সাহায্য করে। ফলে ধানের বৃদ্ধি ও পুষ্টি প্রভাবিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

কচুরী পানা

প্রাকৃতিক শক্তি বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা প্রবাহিত হ'য়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে নিজস্ব নিয়মে চলমান। মানুষ এই শক্তিকেই নানা পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়ে বা তা'র স্বকীয় বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা কাজে লাগায়। অবিনশ্বর এই শক্তির সহজ উৎসগুলিকে মানুষ প্রাথমিক পর্যায়ে কাজে নিয়োগ করে নিজের জীবন যাত্রায় নানা সুবিধার ব্যবস্থা করে এসেছে। সম্ভবতঃ এই ব্যবহারের ফলেই শক্তির সহজপ্রাপ্যতা আপাতঃ দৃষ্টিতে মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। শক্তির অবিনশ্বরতার মৌলিক জ্ঞানই মানুষকে সন্ধান দিয়েছে অমিত শক্তির আধার সূর্যের বিকীর্ণ শক্তির সদ্ব্যবহারের পন্থাগুলিকে। এই বিকীর্ণ জঙ্গম শক্তি স্থবিরত্ব লাভ করে বা আবদ্ধ হয় অনেক আধারেই। তার মধ্যে জীব-জগতের উদ্ভিদ মহল হ'ল সূর্যরশ্মির আলোক ও তাপের অন্যতম প্রধান ভাণ্ডার। প্রাণী তথা মানুষের প্রধানতঃ এই আবদ্ধশক্তিই দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের অন্যতম মাধ্যম। একইভাবে শক্তিকে গ্রহণযোগ্য করায় মানুষ তার গৃহপালিত প্রাণী ও আবাদ করা ফসলকেই মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। এই সবের প্রতিপালন ও পরিচর্যায় বিভিন্ন জৈব উপাদানে আবদ্ধিকৃত শক্তিকে ব্যবহার করায় আধুনিক কালে অধিকতর ব্রতী হয়েছে মানুষ শক্তির রূপান্তর ও চক্রায়নকে সংহত করার মধ্য দিয়ে। এ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করেছি নাইট্রোজেন চক্রের প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে চাষ-আবাদের অনুকূলে কিভাবে উপযোগী করে তোলা যায়। কৃষি পরিবেশে এমনই আরও বহুতর প্রণালী রয়েছে যা' হয়তো এখন আমাদের অগোচরে রয়ে গিয়েছে অথবা যা'র অন্বেষণের প্রয়োজন এখনও আমরা অনুভব করিনি। কিছু এমন অবস্থাও জীবজগতে রয়েছে যা' আপাতঃ দৃষ্টিতে বা বহুল পরিমাণে মানুষের জীবনধারনে অনেক বিপত্তির সৃষ্টি করে বা সমস্যার আকারে দেখা দেয়। তেমনই একটি সমস্যার কথা বর্তমান অধ্যায়ের উপজীব্য। তা' হল কচুরীপানা বা water hyacinth [Eichh-ornia crassipes]

এই কচুরীপানা বর্তমানে তার নিজ আদি বাসভূমি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে

পৃথিবী পৃষ্ঠের সমস্ত জলাশয়ে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এই সমস্যা তাই এখন বিশ্বসমস্যা।

4.1. ভৌগোলিক ব্যাপ্তি :— (Geographical distribution) :—

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কচুরীপানার আদি বাসস্থান সম্ভবতঃ দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল রাজ্যে। মানব সভ্যতার প্রসার ও অভিযাত্রী প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক পরিবেশে নানা কৃত্রিমতার অনুপ্রবেশ করিয়ে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। তারই পরিণতির অন্যতম ও প্রকট প্রমাণ কচুরীপানার দ্রুত প্রসার লাভ। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই কচুরীপানার স্থানচ্যুতির সূচনা হয় এবং স্বল্প সময়েই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জলাশয়েই এই উদ্ভিদ প্রজাতিটি অধ্যুষিত হয়ে পড়ে। 1884 খ্রীষ্টাব্দে কচুরীপানাকে তার আদি বাসস্থানের বাইরে প্রথম দেখা যায় উত্তর আমেরিকাতে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তা' ভারতবর্ষে প্রসারিত হয় ও 1930 সাল নাগাদ অষ্ট্রেলিয়াতেও ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। 1950 সালের দিকে আফ্রিকায় বিভিন্ন নদী, খাল ও জলাশয়ে তা' ছড়িয়ে পড়ে ও 1957য় জাইরেতে সমস্যার আকারে দেখা দেয়। এর প্রায় এক বছরে সুদানে ও মধ্য আমেরিকা থেকে অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। বর্তমানে নিরক্ষীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত জলাশয়ই কচুরীপানার আগ্রাসনে ভীষণভাবে বিপদাপন্ন।

4.2. সমস্যার ব্যাপকতা :—

কচুরীপানার বৃদ্ধি ও বংশবিস্তারের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য এই জলজ উদ্ভিদ নিরক্ষীয় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল সমূহের' নদী, নালা, খাল-বিল ও যে কোনও জলাশয় সবুজ আস্তরণে আবৃত। এই আগ্রাসী প্রকৃতির জন্য জলাশয়ের জৈব জীবন ভীষণভাবে বিপন্ন। এই পানার সাথে অসম প্রতিযোগীতায় জলাশয়ের জৈব বৈচিত্র্য বিনষ্ট হয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কারণ সূর্যকিরণ-প্রিয় জলবাসী প্রাণী বা উদ্ভিদ সমুদয় কচুরীপানার নিবিড় আস্তরণের নীচে আবৃত থেকে সূর্যকিরণ ও তাপ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে ঐ ধরণের প্রাণী বা উদ্ভিদ স্বাভাবিক-ভাবেই স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয় অর্থাৎ জীবনধারণে সমর্থ হয় না। কচুরীপানার আস্তরণ জলাশয়ের সঙ্গে বাতাসকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, ফলে জলে অক্সিজেনের

অভাব ঘটে। মৎস্য বা অন্যান্য জলবাসী প্রাণী জীবনধারণের প্রাথমিক ও অপরিহার্য্য উপাদান অক্সিজেনের অভাবের সম্মুখীন হয় ও ঐ জলাশয় এই ধরনের প্রাণীর বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট জলাভূমির স্বাভাবিক জৈব বাস্তুতে বাস্তব্য বিদ্যাগত বিপর্যয় (ecological chaos) সৃষ্টি হয় যা' সামগ্রিকভাবে পরস্পর নির্ভরশীল অন্যান্য সমস্ত স্তরে এক বিষম অবস্থার সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কচুরীপানার আধিপত্যে জলাশয়ের পরিবর্তিত বাস্তু মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ এই অবস্থা মশার বংশ বিস্তারের পক্ষে খুবই অনুকুল এবং ম্যালেরিয়ার ন্যায় বিধ্বংসী রোগের বাহক হিসাবে মশার ভূমিকা এখন সুবিদিত। কেবল ম্যালেরিয়াই নয়, পীতরোগ, এনকেফালাইটিস্ প্রভৃতির ন্যায় মারাত্মক রোগ ও মশার বিভিন্ন প্রজাতির মাধ্যমে বিস্তারলাভ করে। এই সব রোগের বিধ্বংসী ও সর্বনাশা রূপ সকলেরই ভালভাবে জানা আছে। কচুরীপানা জলাশয়ের পরিবেশকে মশার বংশবিস্তারের পক্ষে যেমন অনুকূল সৃষ্টি করে তেমন কচুরীপানাও কিছু প্রাণীর আশ্রয় ও খাদ্য হিসাবেও ঐ সব প্রাণীর জীবনধারণের বা নতুন পরিবেশে ঐ সব প্রাণীর বিস্তারে সহায়তা করে। শামুক এই ধরনের একটি প্রাণী। কেবল শামুক বিস্তারই সমস্যা নয়, এই শামুক আবার লিভার ফ্লুক (Liver fluke) নামক এক ধরনের মানুষের পরজীবী কৃমির অন্তবর্তী পোষক (alternate host) হিসাবে কাজ করে। শামুক বাহিত অনুরূপ অন্যান্য পরজীবীও মানুষের সিস্টোসোমিয়াসিস্ (Schistosomiasis), ফ্যাসিওলিয়াসিস্ (Fascio-liasis), প্রভৃতি নানা ধরনের মারাত্মক রোগ প্রসারে কচুরীপানার পরোক্ষ ভূমিকা আরও সক্রিয়ভাবে দেখা যায় কারণ, কচুরীপানার অঙ্গসংগঠনীয় বৈশিষ্ট্যে জলস্রোতে ভাসমান হয়ে দেশান্তরে সম্প্রসারিত হয় দ্রুতগতিতে। এই সম্প্রসারণে শামুক ও তদ্বাহিত পরজীবীগুলিও বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে ও উন্নতিশীল দেশের পয়ঃপ্রণালী ও সেচের খালের মাধ্যমে ঐ সব দেশে রোগের প্রসার ঘটে। এমন ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কচুরীপানার আবরণ জলকে বাতাসের সরাসরি সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করে, জলে অক্সিজেনের মিশ্রণ ব্যাহত করে, জলজ প্রাণী ও অন্যান্য উদ্ভিদের স্বাভাবিক শ্বাসকার্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে জলে তাদের জীবনযাত্রা অসম্ভব করে তুলে কচুরীপানা আগ্রাসনের পূর্বের জলীয় স্বাভাবিক বাস্তুর বিপর্যয় আনয়ণ করে। এছাড়াও কচুরীপানার জীবনকালের শেষে মৃত কচুরীপানা

ক্রমাগত জলাশয়ে জমতে থাকে। এই দেহাবশেষের পচন ক্রিয়াও জলের অক্সিজেন হ্রাস করে ও পচনজনিত অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ জলের দূষণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে জলাভূমির বাস্তব আরও নানা পরিবর্তন সাধন ক'রে স্বাভাবিকতা নষ্ট করে নতুন এক বাস্তব সৃষ্টি করে।

ধানজমিতেও এই কচুরীপানা নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। জলপূর্ণ ধানের ক্ষেত কচুরীপানার বৃদ্ধির পক্ষে বেশ অনুকূল। এই পানার দ্রুত বৃদ্ধি জমির উপর মোটা সবুজ আস্তরণের সৃষ্টি করে ধানবীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও সূর্যালোক প্রবেশ অসম্ভব করে তোলে। ফলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হতে পারে না। এমন কি ছোট ধানের চারাও পানার মোটা আস্তরণ ভেদ করে উঠতে সক্ষম হয় না। ফলে ধানচাষ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া, কচুরীপানার দেহ উৎপাদনের 96% হ'ল জল। পানার শরীরের এই জল আসে জলাশয় বা ধানক্ষেতে জমা জল থেকেই। হিসাবে দেখা যায় এক হেক্টর জমিতে কচুরীপানা পূর্ণ আস্তরণ নিজের শরীরে প্রায় 5,700 ঘন মিটার আবদ্ধ করে রাখে। কেবল তাই নয়, উদ্ভিদ জীবনের স্বাভাবিক ক্রিয়া হিসাবে শরীর থেকে বাষ্পীভবন দ্বারা জল বাতাসে চালিত করে। ক্রমাগত এই ক্রিয়ার ফলে নিষ্কাশিত জল নিরন্তর জলাশয় থেকেই গ্রহণ করে। এই ভাবে জলাশয় থেকে স্বাভাবিক বাষ্পীভবন দ্বারা নিষ্ক্রান্ত জল অপেক্ষা 3-5 গুণ বেশী জল কচুরীপানা নষ্ট করে। চাষ-আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় জল এই ভাবে পানার শরীর আবদ্ধ হওয়া ও বাষ্পীভবন দ্বারা নষ্ট হওয়ার জন্য কি সমস্যার সৃষ্টি হয় তা' সহজেই অনুমান করা যায়।

নদীনালা, খাল-বিল বা অন্যবিধ জলাশয় ও জলাধারে কচুরীপানা জন্মালে এই ব্যবহার্য্য জলের উৎসগুলি বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে কচুরীপানার দেহাবশিষ্ট জৈব উপাদান ঐ জলাধারগুলির মধ্যে জমা হতে থাকলে তাদের জলধারণ ও পরিবহণ ক্ষমতা অচিরে নষ্ট হয়ে যায়। পানার আস্তরণ জলযানের যন্ত্রপাতিরও ক্ষতিসাধন করে এবং জলাধারে বা খালের জলে জলবিদ্যুৎ তৈরী করার যন্ত্রপাতি বা সেচের পাম্প ইত্যাদি বিকল হয়ে যায়, পানা আবদ্ধ হয়ে গিয়ে।

4.3. সমস্যা সমাধানের উপায় :—

কচুরীপানা-সৃষ্ট উক্ত সমস্যাবলীর সমাধানের নানা প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু প্রাকৃতিক অন্যান্য নানা অজৈব ও জৈব প্রক্রিয়ার ন্যায় কচুরীপানার আক্রমন প্রতিরোধে মানুষ বিফল হয়েছে বারবার। সেই কারনেই কচুরীপানা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে যা' মানুষের প্রতিরোধ প্রচেষ্টার বিফলতার সাক্ষ্য বহন করে। বাংলায় এই পানা 'নীল দানব' (Blue devil) ও ভারতের অন্যত্র "বাংলার আতংক" (Bengal terror) নামে অভিহিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তা 'ফ্লোরিডা দানব' (Florida devil) ও বাংলাদেশে 'জার্মান আগাছা' (German weed) নামে পরিচিত।

এই ভয়াবহ সমস্যা সমাধানে মানুষের প্রচেষ্টাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিভিন্ন কারনে পানার আক্রমণ প্রতিরোধ বা দমন করা এককভাবে প্রায় অসম্ভব। সহজ ও সাধারণ উপায়ে পানা অপসারণ করে তা' নষ্ট করা যেতে পারে। দেখা গেছে, এই পদ্ধতির মজুরী অনেক বেশী কারণ একদিকে এর বৃহদায়তন দেহ উপাদান সংগ্রহণ ও অন্যদিকে তা' বহন করে নির্দিষ্ট স্থানে জমানো বেশ খরচ-সাপেক্ষ ; রাসায়নিক আগাছাদমনকারী ঔষধের ব্যবহার করে হয়তো সহজেই কচুরীপানা বিনাশ করা সম্ভব। কিন্তু এই ঔষধ ব্যবহারের আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলিও বিবেচনা করা দরকার। যেমন, এই ঔষধগুলি সাধারনভাবে পরিবেশের পক্ষে পুরোপুরি অহিতকর নয়। জলাশয়ে এর প্রয়োগ জলের রাসায়নিক দূষন জনিত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও একেবারে কচুরীপানার পক্ষে সুনির্দিষ্ট বা নির্বাচিত ঔষধ (Selective herbicide) পাওয়া দুষ্কর। ফলে, আগাছা দমনকারী ঔষধ জলজ অন্যান্য উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। কেবল তাই নয়, পানার ব্যাপক উৎসকে এইভাবে মূলোচ্ছেদ করা কতদূর সম্ভব তাও যেমন খতিয়ে দেখার প্রয়োজন তেমনই স্থানীয়ভাবে এই পদ্ধতিতে পানার দমন করলে মৃতপানার দেহাবশেষ জলধারে বা খালেই জমা হয়ে তা'র উপযোগীতা হ্রাস করবে সে কথাও বিবেচনা করা দরকার।

পৃথিবীর ব্যাপক অঞ্চলে কচুরীপানার এই যে সমস্যা তা' কিন্তু তার নিজস্ব আদি বাসভূমি ব্রাজিলে তেমন প্রকট নয়। জৈব ও প্রাকৃতিক নিয়মেই কচুরীপানার বৃদ্ধি হার একটি পর্যায় পর্যন্তই থাকে তা' সীমা ছাড়িয়ে যায় না। কচুরীপানার ওপর নির্ভরশীল নানা প্রাণী, যথা, কীট, শামুক ইত্যাদি বা নানাধরনের রোগ কচুরীপানার বৃদ্ধিকে সংহত করে রাখে। কিন্তু নতুন ব্যাপ্ত অঞ্চলে ঐ ধরনের স্থানীয় কোনো প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক না থাকায় তা' সীমাহীন বা

অপ্রতিহতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে প্রকৃত সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে নতুন সঞ্চারিত অঞ্চলে কচুরীপানা ও তা'র স্থানীয়ভাবে নতুন নতুন শত্রুর সম্মুখীন হচ্ছে। কচুরীপানার এই সব জৈব শত্রুর সদ্ব্যবহার এই সমস্যা প্রশমনের জৈব দমন পদ্ধতির (Biocontrol method) প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন মার্কিন বিজ্ঞানীরা দক্ষিন আমেরিকার আর্জেন্টিনাতে কচুরীপানাভোজী বিশেষ এক কীটের সন্ধান পেয়েছেন। এই কীট, **নিওচ্যাটিনা আইকোর্নিয়া** (**Neochatina eichhornia** ; Curculionidae : Coleoptera) একমাত্র কচুরীপানাকেই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। কাজেই, এই কীট কচুরীপানাকে পূর্নভাবে নিঃশেষ করে নিজেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অন্য কোনও গাছে তা' ক্ষতি করে না। পুয়ের্টোরিকোতে (Puertorico) এক ধরনের উদ্ভিদভোজী শামুক **ম্যারিশা কর্নু য়ারিয়েটিস্** (**Marissa cornuarieties**), সফলতার সঙ্গে কচুরীপানা দমনে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতবর্ষেও **গ্যাসোনিউলা পাংটিফ্রন্স** (**Gasonula punctifrons** ; Acriididæ : Orthoptera) নামক ফড়িং এর ব্যবহারের সুফল পাওয়া গেছে এবং গায়ানায় **ট্রাইচেকাস্ ম্যান্যাটি** (**Trichechus manatee**) নামক স্তন্যপায়ী নিরক্ষীয় প্রাণীর ব্যবহারে অভিপ্রেত ফল পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এইভাবে বিভিন্নস্থানে আঞ্চলিক ভাবে কার্যকরী জৈব শত্রুর সন্ধান করে তা'র সঠিক প্রয়োগ দ্বারা কচুরীপানার প্রকোপ কমানো যেতে পারে। তবে এই জৈব দমন পদ্ধতির সঠিক নিরূপণ ও তা'র প্রয়োগ দ্বারা অভিপ্রেত সুফল লাভ সময় সাপেক্ষ ও প্রাকৃতিক নিয়মেই নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়ে অচিরেই এই কার্যকারিতাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাজেই বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বিত ব্যবহার দ্বারা ফসলের শত্রুদমনের ন্যায় কচুরীপানা দমনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

4.4. জৈব উপাদানের বিশ্লেষণ ও তার উপযোগিতা :—

যে কোনও বাস্তুতে বসবাসকারী জীব কোনও না কোনও ভাবে ঐ বাস্তুর স্থিতি ও চলমানতাকে বজায় রাখায় কিছু সক্রিয় বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ করে থাকে। তা' আপাতঃদৃষ্টিতে বা সাময়িকভাবে ভারসাম্যের পক্ষে পরিপন্থী হ'তে পারে তবে তা' একসময়ে স্থিতাবস্থায় উপনীত হয়। হয়তো তা'তে বাস্তুর স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে। বাস্তব্য বিজ্ঞানের এই মূল সূত্রটিকে উপজীব্য করে বিজ্ঞানীরা কচুরীপানার আগ্রাসী প্রকৃতির মধ্যেও কিছু ব্যবহারিক

দিক সন্ধান করেছেন ও তার মূল্যায়ন এবং প্রয়োগের কথা চিন্তা ও নির্ণয়ের দিকটি উদ্ঘাটিত করেছেন। সুতরাং কচুরীপানার দমনের একমুখীন প্রচেষ্টার কেবল খরচের দিকটিকে দমন ও অর্থনৈতিক কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের উদ্যোগে পরিণত করার প্রচেষ্টাটি প্রনিধানযোগ্য।

জলদূষণ নিরাময়ঃ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ও শিল্পের বর্জনীয় পদার্থ প্রতিনিয়তই জলাশয়, জলাধার ও জলপথগুলিকে দূষিত করে চলেছে। এই দূষিত পদার্থ নানা জৈব ও অজৈব যৌগের ও মৌলিক ধাতুর সমাহার। আবাস নির্গত দূষিত জল যে সমস্ত জলাধারে বা সেচখালে সঞ্চিত হয় তা' ধাতব লবণে প্রায় সম্পৃক্ত থাকে। কচুরীপানা এই সব ধাতব লবণ জল থেকে শোষন করে নিয়ে নিজের দেহ উপাদানে পরিবর্তিত করতে পারে। এছাড়াও দেখা গেছে, উপযুক্ত পরিবেশে কচুরীপানা প্রতি হেক্টর দূষিত জলাশয় থেকে প্রতিদিন 22-44 কেজি. নাইট্রোজেন, অনুরূপ পরিমাণ পটাসিয়াম্, 18-34 কেজি. সোডিয়াম্, 11-22 কেজি. ক্যালসিয়াম্, 8-17 কেজি. ফস্ফরাস্, এবং 2-4 কেজি. ম্যাগ্নেশিয়াম্ অপসারণ করতে পারে। ঐ একই ঘনত্বের কচুরীপানা শিল্প কারখানা নির্গত অতিরিক্ত দূষিত পদার্থ যথা 89 গ্রাম পারদ, 104 গ্রাম সীসা, 297 গ্রাম নিকেল, 321 গ্রাম স্ট্রানশিয়াম্, 343 গ্রাম কোবাল্ট, 385 গ্রাম রৌপ্য এবং 398 গ্রাম পরিমাণ ক্যাডমিয়াম্ ও তৎসহ 2,134 গ্রাম ফেনল ও অন্যান্য জৈব যৌগ অপসারণ করতে পারে। আমেরিকায় জাতীয় বায়ুযান ও মহাকাশ অধিকার (NASA) নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগারে এই তথ্য প্রতিদিন 18-36 টন কচুরীপানা অপসারণের সূত্রে সংগৃহীত। আবার এই সংগৃহীত কচুরীপানা থেকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উক্ত ভারী ধাতুগুলিকে পৃথকীকরণও সম্ভব।

ব্যবহারযোগ্য গ্যাস উৎপাদনঃ যান্ত্রিক উপায়ে বা মজুর দ্বারা সংগৃহীত কচুরীপানা কর্তন ও পেষণের পর পদ্ধতিতে মিথেন জীবাণুর সহায়তায় জৈব বিজারণ কক্ষে (fermentation chamber) দিয়ে নিবাত বিক্রিয়ার গ্যাসে পরিণত করা যায় যা' থেকে 60—90% মিথেন ও 10—40% কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উদ্ভূত হয়। এই গ্যাসের তাপমূল্য (Calorific value) প্রতি ঘন মিটারে 5,292 কিলো ক্যালরী এবং কার্বন ডাই অক্সাইড মুক্ত করণ দ্বারা এই উৎপাদিত গ্যাসের তাপমূল্য 7,963 কিলো ক্যালরীতে বর্দ্ধিত করা যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস যে সমস্ত কাজে ব্যবহার করা হয় সেইসব কাজে যথা, রান্না, গরম করা এবং শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আংশিকভাবে

এই গ্যাস স্থানু ইঞ্জিন (Power stationary engines), ট্র্যাক্টর, ও গাড়ী চালানোর কাজেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এই গ্যাস এই ধরনের ব্যবহারের উপযোগী করে বোতলজাত করার পূর্বে কার্বন ডাই অক্সাইড মুক্ত করা প্রয়োজন। এক কেজি. শুষ্ক কচুরীপানা থেকে প্রায় 393 লিটার পরিমাণ জৈব গ্যাস পাওয়া যেতে পারে অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে প্রতি 900-18000 কেজি. শুষ্ক কচুরীপানা থেকে দিনে 233-465 লিটার পেট্রোলের সমতুল উত্তাপ উৎপাদিত হতে পারে।

সুতরাং দেখা যায়, গ্রামীন অর্থনীতিতে কচুরীপানা থেকে প্রাপ্ত এই জৈব গ্যাস এক পরিপূরক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সুদূর গ্রামে, যেখানে অন্যবিধ শক্তি উৎস সরবরাহ সহজসাধ্য নয়, সেই সব অঞ্চলে স্থানীয় এই আপাতঃ বিপদকারী আগাছাকে স্বল্পমূল্যে, সহজ পদ্ধতিতে বিজারিত করে পরিবেশের পক্ষে অহিতকর এই গ্যাস উপাদান গ্রাম্য জীবনে উন্নতি আনতে পারে।

কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার : কৃষিক্ষেত্রে অর্থাৎ ফসল উৎপাদনে অথবা গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসারে কচুরীপানার নানা দিক থেকে মূল্যায়ন করা হয়েছে পরীক্ষা-মূলকভাবে এবং তাতে উৎসাহ ব্যাঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে।

ফ্লোরিডার চুন দেওয়া ওয়াচুলা মিহিবালু জমিতে (Wachula fine sand) মোটামুটি শুষ্ক কচুরীপানা (18% জলীয় অংশসহ) যোগ করে বাজরা (pearl millet) উৎপাদন বেশ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। মোট প্রদত্ত শুষ্ক কচুরী-পানার পরিমান হেক্টর প্রতি 27,000 কেজি.তে রাসায়নিক সারের থেকে বেশী উৎপাদন পাওয়া গেছে। কচুরীপানা যোগ করায় মাটীর প্রকৃতিগত উন্নতির সঙ্গে জমির কার্বন, নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম্, ক্যাল্সিয়াম্, ম্যাগ্নেশিয়াম্, জিংক্, ম্যাঙ্গানীজ্ ও ক্লোরিনের পরিমান বাড়ানো গেছে, ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে ও মাটীর পরিবেশ ফসল বৃদ্ধির পক্ষে বহুল পরিমানে উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়েছে। এই তথ্য নিরক্ষীয় ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চলের কৃষির পক্ষে একটি উৎসাহ ব্যঞ্জক ইঙ্গিত, কারণ পৃথিবীর গরীব দেশগুলি রয়েছে এই অঞ্চলেই বেশী। টুকরো করা ও গোটা কচুরীপানাকে সহজেই পেষন দ্বারা 75% পর্যন্ত জল নিষ্কাশন করে ফেলা যায় ও কৃষিকাজের উপযোগী করে তোলা যায়। এমন কি জৈব গ্যাস তৈরী করার পর কচুরীপানার যে অবশিষ্টাংশ থাকে তাও জমির জৈব সার হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ততা হারায় না। কারণ

এতে নাইট্রোজেন নষ্ট হয় না। ফস্‌ফরাস্‌ ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ অবিকৃত অবস্থাতেই থাকে।

সরকার ও তাঁর সহকর্মীর (সরকার ও রায়, 1961) বিভিন্ন গবেষণা থেকে আরও কয়েকটি আকর্ষণীয় তথ্য জানা গেছে যা' কৃষিকাজের বা ফসলের অধিকতর উৎপাদনের পক্ষে গ্রহণীয় হ'তে পারে। কচুরীপানা শিকড়ের নির্যাস প্রয়োগের দ্বারা চীনাবাদাম, ছোলা, মটর, সরিষা এমনকি ধানেরও বৃদ্ধি লক্ষণীয়ভাবে বেশী হ'তে দেখা গেছে। এই বৃদ্ধি জিব্বারিলিক্‌ অম্লের (Gibberelic acid) ন্যায় বৃদ্ধি উত্তেজক (growth hormone) পদার্থের ন্যায় কাজ করে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে উক্ত উত্তেজক, ইণ্ডোল এসেটিক্‌ এসিড, ইত্যাদি অপেক্ষা অধিক কার্যকরী বলে প্রতিভাত হয়েছে। এই কচুরীপানা শিকড় নির্যাস প্রয়োগে অংকুরিত ছোলা ও মটরের শরীরে শর্করা জাতীয় পদার্থের ও নাইট্রোজেন বিজারণের (metabolism) হার বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে এবং 8 দিন পরেও তৃতীয় হতে পঞ্চম সন্ধিপর্বে শর্করা ও আমিষ জাতীয় পদার্থের অধিকতর সঞ্চয়ন লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য শিকড় নির্যাসের প্রকৃত রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যটি এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে।

গৃহপালিত প্রাণী যথা শুকর, ভেড়া, গো-মহিষাদি ও মুরগীর খাদ্য হিসাবেও কচুরীপানার সম্ভাবনার বিষয়টি পরীক্ষার দ্বারা নিরূপিত হয়েছে। পেষন দ্বারা টুকরো বা গোটা কচুরীপানার অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ প্রায় 75% পর্যন্ত কমিয়ে আরও কিছু সহযোগী—ও প্রয়োজনীয় উপাদান সংযোগ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষন করে গৃহপালিত খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পেষন দ্বারা জল নিষ্কাশনের ও শুষ্ককরণের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যে কিছু প্রয়োজনীয় পদার্থ নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাতে থাকে 12-18% কাঁচা (crude) আমিষ জাতীয় পদার্থ, ছাই (ash) 25-35%। এই পদার্থগুলির এই পরিমান জমিতে উৎপাদিত পশুখাদ্যের পরিমাণের সঙ্গে তুলনীয় মানের এবং প্রায় সম-পরিমাণেই থাকে ক্যাল্‌সিয়াম-ফস্‌ফরাসের অনুপাত, নাইট্রেট, অক্সালেট ও সায়ানাইডের পরিমান। শুষ্ক কচুরীপানার চাঙ (pellets) পশুখাদ্যের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে কারণ তা' তুলাবীজের তুঁষ বা আখের ছিবড়ের সাথে তুলনীয় এবং গৃহপালিতের পক্ষে সঠিকভাবে প্রস্তুত কচুরীপানার পশুখাদ্য সমানভাবেই গ্রহণযোগ্য।

উল্লিখিত সার্থক ব্যবহারযোগ্যতা কচুরীপানার আগ্রাসন আতংকে মঙ্গলময় প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে

জলাশয়, জলাধার, নদী-নালা, খাল-বিল, চাষের জমিতে কচুরীপানা যে বিবিধপ্রকার সমস্যা সৃষ্টি করে, তা' সহনীয় খরচে গ্রামীন অর্থনীতিতে বিভিন্ন-ভাবে সহায়কের ভূমিকায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। এমন কি কচুরীপানা পরমাণু তেজস্ক্রিয় দূষণ কমাতেও সমর্থ, কারন এই পানা তেজস্ক্রিয় পদার্থ শোষন করার ক্ষমতা সম্পন্ন এবং পূর্বেই যা' উল্লেখ করা হয়েছে সেই শিল্প কারখানার বর্জ্য দূষিত, নানাধরনের ভারী ধাতু, নদীর জল থেকে মুক্ত করে প্রাকৃতিক বা জৈব পাতন যন্ত্রের ন্যায় কাজ করে।

পঞ্চম অধ্যায়

আরও কয়েকটি জলজ আগাছার উপযোগিতা

জলজ আগাছার পরিচিতি বিষয়ে আলোচনাতে প্রথমে বুঝবার প্রয়োজন 'আগাছা' বলতে আমরা কী বুঝি। সাধারণ সংজ্ঞানুসারে কৃষিভূমিতে মূল ফসল ভিন্ন অন্য যে কোনও উদ্ভিদই 'আগাছা' হিসাবে গণ্য। অবশ্য সাথী ফসল হিসাবে একাধিক শস্যের চাষ করা হয়। সাথী ফসল হিসাবে ব্যবহৃত মূল ফসলের সহগ বা মিশ্র আবাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিপ্রেত ফসল থেকে উৎপাদন লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং সহজ কথায় বলা যেতে পারে যে আবাদী জমিতে অনভিপ্রেত উদ্ভিদই হল আগাছা। তেমনই জলাধারে, পয়ঃপ্রণালীতে বা অন্যান্য জলাশয়ে কিছু উদ্ভিদ থাকতে পারে যা নানাভাবে আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে বা সৌন্দর্য্যগত দিক থেকেও অনাকাঙ্খিত হ'তে পারে। সেই ধরনের উদ্ভিদকেও আগাছা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন, নানা ধরনের পানা।

পূর্ববর্তী আলোচনা মূলতঃ দুটি জলজ আগাছার অর্থাৎ **'য়্যাজোলা'** ও 'কচুরীপানা'র বিষয়ে নিবদ্ধ। এই দুটি আগাছার সহজপ্রাপ্তি ও তাদের বিষয়ে মোটামুটিভাবে বিশদ অন্বেষণ ও গবেষণা বিজ্ঞানী মহলে হওয়ায় বেশ গ্রহণযোগ্য তথ্য জানা গেছে ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর আগ্রহ সঞ্চারের চেষ্টা হয়েছে। এই দুটি জলজ আগাছা ছাড়া আরও অনেক তেমন ধরনের আগাছা প্রায়শঃই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ সেগুলির বিষয়ে যা' হয়েছে তা' প্রধানতঃ মৌলিক গবেষণা এবং ব্যবহারিক দিকগুলির বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তথাপি সাধারণ কতকগুলি ব্যবহারিক দিক আমরা জানতে পারি ও গবেষণা নির্ধারিত না হয়েও তা'র বেশ ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। সেই কারণে ঐ আগাছাগুলিকে অনভিপ্রেত ভাবার বা কেবল সমস্যা সৃষ্টিকারী বলে বিবেচনা করা সমীচীন হবে না। একটু সচেষ্ট মন নিয়ে ঐ আগাছাগুলির ব্যবহারযোগ্যতা খতিয়ে দেখে সমস্যার আকার ধারণ করতে না দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান অবস্থায় রয়েছে।

বর্তমান প্রতিবেদনে আলোচিত জলজ আগাছা অবশ্য সব অনভিপ্রেত উদ্ভিদই নয়। অনভিপ্রেত উদ্ভিদ বা আগাছা, যেগুলি সহজে ও উল্লেখ্য পরিমাণে কৃষিক্ষেত্রে বা কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করা সম্ভব, সেগুলির পরিচয় উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাসের ধারামতে দেওয়া দুষ্কর। মোটামুটি উদ্ভিদতত্ত্বের ভিত্তিতেই এই পরিচিতি আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জীব বিজ্ঞানে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান নিয়ে বিভিন্ন মত ও পদ্ধতি বর্তমান। উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানও এর ব্যতিক্রম নয়। সাধারণভাবে, এককোষী উদ্ভিদ যথা বীজাণু (Bacteria), শৈবাল (Algae) ও ছত্রাক (Fungi) জাতীয় উদ্ভিদগুলিকে উদ্ভিদ জগতের অপুষ্পক শ্রেণীর (cryptogams) একটি উপজগৎ (Sub-kingdom) থ্যালোফাইটা'র (Thallophyta) অন্তর্গত করা হয়ে থাকে। শৈবাল ও ছত্রাকের অঙ্গসংগঠনিক দিক থেকে নানা বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও এদের নিজস্ব প্রজননগত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য শৈবাল হল নীলাভ-সবুজ শৈবাল (Blue green algae)। এই শৈবালের যে উর্দ্ধতন বিভাগের জলজ আগাছার ব্যবহারিক দিক আছে তা'হল বর্তমানকালে বহু আলোচিত **য়্যাজোলা** (Azolla) ও এরই সমগোত্রীয় **স্যালভিনিয়া** (Salvinia)। এই দুইটি আগাছাই সাধারণভাবে পরিচিত স্যালভিনেসী (Salvinaceae) গোষ্ঠীর অন্তর্গত ঢেঁকিশাক বিভাগ-ভুক্ত, যা উদ্ভিদতত্ত্বীয় ভাবে টেরিডোফাইটা (Pterydophyta) নামে পরিচিত। অবশ্যই ঢেঁকিশাক বা ফার্ণ স্যাঁতসেঁতে জায়গায় জন্মালেও এদের স্বভাবগত ভাবে স্থলজ উদ্ভিদ বলা হয় এবং ফার্ণের মধ্যে এই **য়্যাজোলা** ও স্যালভিনিয়া'ই হ'ল এই বিভাগের জলজ প্রতিনিধি। এরা উভয়েই স্যালভিনেসী গোষ্ঠীর (family Salvinaceae) অন্তর্গত হেটেরোস্পোরাস্ লেপ্টোস্পোরাঞ্জিয়েট্ টেরি-ডোফাইটা (Heterosporus Leptosorangiate Pterydophyta)। সংবাহী তন্তুগুচ্ছ (Fibro-vascular bundle) সমন্বিত উদ্ভিদের উদ্ভবে এই টেরিডোফাইটাই যেমন আদিমতম উদ্ভিদ বিভাগ, তেমনই এই বিভাগের স্যাল-ভিনেসী (Salvinaceae) গোষ্ঠী বোধ হয় সবীজ (Seed) উদ্ভিদের পূর্বসূরী। সবীজ উদ্ভিদের দুইটি শাখার মধ্যে ব্যক্তবীজী (Gymnospermae) উদ্ভিদের (যথা ঝাউগাছ) কৃষিভূমিতে সরাসরি ব্যবহার জানা নেই। এরা প্রধানতঃ স্থলবাসী শৈত্যমণ্ডলীয় উদ্ভিদ। তবে গুপ্তবীজী (Angiospermae) উদ্ভিদের মধ্যে একদলবীজী (Monocotyledonae) বেশ কিছু জলবাসী

উদ্ভিদকে (কচুরীপানা, টোপাপানা, ক্ষুদে পানা, ইত্যাদি) কৃষিকর্মে সার হিসাবে ব্যবহারের উপযোগিতার বিষয়টি অধুনাকালে বেশ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। রাসায়নিক কৃত্রিম সারের বিকল্প হিসাবে এই পরিবেশ চেতনার ও কৃত্রিম সারের আশু সংকটের কথা চিন্তা করেই শৈবাল থেকে আরম্ভ করে কচুরীপানা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষিক্ষেত্রে জলজ আগাছার ব্যবহারকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা হচ্ছে।

উল্লেখিত এই জলজ আগাছাগুলির পরিচিতি বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি পদক্ষেপ। কারণ কৃষিভূমিতে বহু ধরনেরই আগাছার সাক্ষাৎ মেলে কিন্তু সবগুলিরই ব্যবহারিক প্রয়োগ তেমন সুবিধাজনক বা লাভজনক নয়।

5.2. জলজ অপুষ্পক আগাছা :—

উদ্ভিদতত্ত্বীয় বিচারে বিবর্তনের প্রাথমিক দিকের উদ্ভিদের প্রতিনিধি হল এই অপুষ্পক উদ্ভিদ। এর মধ্যে সচরাচর খুবই চোখে পড়ে **নীলাভ-সবুজ শৈবাল**। যদিও আরও বহু বিভিন্ন ধরনের শৈবাল কৃষিক্ষেত্রের আবদ্ধ জলে দেখা যায়। এছাড়া আছে ফার্ণজাতীয় (Pterydophyta) জলজ উদ্ভিদ **য্যাজোলা** ও **স্যালভিনিয়া** যা' কৃষিক্ষেত্রে সার হিসাবে ব্যবহারের সম্ভাবনাপূর্ণ।

5.2.1. নীলাভ-সবুজ শৈবাল : থ্যালোফাইটার এই শৈবাল খুবই পুরা-শারীরবৃত্তের বা প্রাকৃত (Prokaryote) কোষ সমন্বিত এককোষী উদ্ভিদ সায়ানোফাইটা (Cyanophyta) বিভাগের অন্তর্গত। কোষের গঠন খুবই সরল, এমনকি প্রকৃত বা সুগঠিত নিউক্লিয়াস বা ক্রোম্যাটোফোর অবর্তমান। নিউক্লিয়াসের কাজ সেণ্ট্রোপ্লাজম (Centroplasm) নামক কেন্দ্রীয় অংশ দ্বারা হয়—এর চারিদিকে নিউক্লিয়াস আচ্ছাদন (Nuclear membrane) নেই অথবা নিউক্লিওলাস (Nucleolus) নেই। এই কেন্দ্রীয় অংশের চারিদিকে থাকে ক্রোমোপ্লাজম (Chromoplasm)। এই ক্রোমোপ্লাজম স্তরীভূত (lamellate) ভাবে থাকে তবে উচ্চতর উদ্ভিদের সবুজ কণিকার (Chloroplast) ন্যায় সাইটোপ্লাজম থেকে নির্দিষ্ট আস্তরণ (membrane) দ্বারা পৃথকভাবে থাকে না। তবে এই ক্রোমোপ্লাজ্‌ম্‌ই অন্যান্য উদ্ভিদের সবুজ কণিকার কাজ করে এবং থাকে বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক (Pigment) পদার্থ। এই বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের অনুপাতই প্রজাতি বিশেষের নির্দিষ্ট রঙ-এর নিয়ামক। বহিরাবরক বা কোষগাত্রের (Cell wall) বাহিরে আঠালো আবরণ

(gelatinous sheath) থাকে যার ভিতরে থাকে জীবাণু (Bacteria) গাত্রের ন্যায় মিউকোপেপটাইড (Mucopeptide)। এই এককোষী উদ্ভিদ সাধারণভাবে গোলাকার বা উপবৃত্তাকার এবং অধিকাংশ সময়েই সংঘবদ্ধভাবে বা সূত্রাকারে (filamentous) থাকে।

5.2.2. য়্যাজোলা : পাতাগুলি স্তবকিত অবস্থায় থাকে এবং কাণ্ড প্রায় দেখাই যায় না। তবে প্রকৃত মূলের উদ্ভব হয় কাণ্ডের তলদেশ থেকে এবং মূলের সূচনা পর্যায়টিই এই উদ্ভিদের কাণ্ডের অবস্থিতি নির্ণয়ে সহায়তা করে। পাতাসহ কাণ্ডগুলি সততঃই শাখায় বিভক্ত হতে থাকে ও এই শাখা বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করতে থাকে ও দ্রুত বিস্তারলাভ করতে থাকে। এর বৈশিষ্ট্য হল পাতাগুলি পাশের দিকে বৃদ্ধি পায়। এর মূলের সংখ্যা স্বল্প। পাতার নীচের দিকে এদের অনুবীজ (spore) অঙ্গ তৈরী হয়—স্ত্রী অণুবীজ আকারে ছোট ও পুরুষ অণুবীজ কাণ্ড (microsporangia) গোলাকার ও আয়তনে স্ত্রী অণুবীজ কাণ্ড (megasporangia) অপেক্ষা বড়-**য়্যাজোলার** পাতা পৃষ্ঠদেশ ও তলদেশে নির্দিষ্ট ভাবে বিভক্ত। তলদেশে যেমন অণুবীজ কাণ্ড (sporocarp) থাকে তেমন পৃষ্ঠদেশে অংকীয় অঞ্চলে বেশ বড় একটি গহ্বর থাকে যার ভিতর নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী **নীলাভ-সবুজ শৈবাল য়্যানাবিনা য়্যাজোলী** (Anabaena azollae) এর আবাস।

5.2.3. ইঁদুর কানপাশা বা স্যালভিনিয়া : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই গণভুক্ত পানাগুলি বা আগাছাগুলি **য়্যাজোলার** নিকট আত্মীয় অর্থাৎ স্যালভিনেসী গোষ্ঠীভুক্ত ফার্ণজাতীয় বীরুৎ। সারা পৃথিবীতে এর দশটি প্রজাতি ব্যাপ্ত রয়েছে ও এরা মিঠা জলের অধিবাসী ও ভাসমান অবস্থায় থাকে। এদের উদ্ভবস্থান মনে হয় আফ্রিকার উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চল। ভারতে বর্তমানে এর দুইটি প্রজাতি দৃষ্টিগোচর হয়—**স্যালভিনিয়া ন্যাটান্স** (Salvinia natans) এবং **স্যালভিনিয়া কুকুলাটা** (Salvinia cucullata)।

এর পাতাগুলি ঠিক স্তবকিত অবস্থায় থাকে না। পাতার তলদেশ থেকে রোমাকৃতির বহু অংশ নির্গত হয় যা মূলের কাজ করে, তবে এগুলি প্রকৃত মূল নয়। এর স্ত্রী ও পুরুষ অণুবীজকাণ্ড প্রায় একই রকম গোলাকার।

এদের গ্রন্থিকাণ্ড (rhizome) শাখা-প্রশাখাযুক্ত ও প্রায় 10-12 সেমি. লম্বা। গ্রন্থিকাণ্ড থেকে পত্রগুলি তিনটি পরস্পর আবর্তে সজ্জিত অবস্থায় থাকে। এই তিনটি পত্রের মধ্যে দুটি জলের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে। কিন্তু তৃতীয়

পত্রটি পরিবর্ধিত হয়ে ও বহুধাবিভক্ত হয়ে সরু সরু অংশ গঠন করে জলের মধ্যে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে। এই তৃতীয় পত্রটিই মূলের কাজ করে অর্থাৎ জল থেকে খাদ্য আহরণের কাজ চালায়। ভাসমান পত্র তুইটি শক্ত নাসিকাগুচ্ছের ও সুতার ন্যায় অংশের দ্বারা সংযোজিত হয়ে জলে ভাসমান থাকতে সমর্থ হয়। এই উদ্ভিদের এই সব অংশ সমেত এর আকার হয় সাধারণতঃ 5—7·75 সেমি.

এই উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি বা বিস্তার সাধিত হ'তে পারে দ্বিবিধ পদ্ধতিতে। বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশে এর বিস্তার হয় প্রধানতঃ অযৌন জনন পদ্ধতিতে। অর্থাৎ গ্রন্থিকাণ্ডের বৃদ্ধি ও তাদের ছিন্ন অংশের দ্বারা নতুন উদ্ভিদের জন্ম হ'য়ে থাকে। তবে প্রতিকূল পরিবেশে যৌন জনন দ্বারাই এদের বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ ঘটে থাকে। মূলের ন্যায় পরিবর্তিত ডুবন্ত পত্রের গায়ে রেণুস্থলীগুচ্ছ (sporocarp) দেখা দেয়। এই রেণুস্থলীগুচ্ছই যৌন জননের অঙ্গ।

য়্যাজোলার নিকট আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও **স্যালভিনিয়া** নিয়ে তেমন গবেষণার কথা শোনা যায় না। কাজেই এই ফার্ণজাতীয় জলজ উদ্ভিদটির সঠিক ব্যবহারিক উপযোগিতার মূল্যায়ন করাও সম্ভব নয়। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই আগাছা বিশেষ সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছে যেমন **কচুরীপানা** সারা ভারতের কেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সাধারণ বিচারে এই জলজ আগাছাটিকে পরিকল্পিতভাবে সংগ্রহ করে ও পচিয়ে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। নিয়মিত সংগ্রহণ দ্বারা বিরূপ ক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে তেমনই এই সংগৃহীত ফার্ণ সঠিকভাবে পচিয়ে কৃষিজমিতে ব্যবহার করে জৈব সারের অভাব অনেকাংশে মেটানো যেতে পারে।

5.3. সপুষ্পক শ্রেণীর জলজ আগাছা :—

5.3.1. টোপা পানা : এই পানার নিয়মিত অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য একে ইংরেজীতে ওয়াটার লেটুস্ (water lettuce) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভারতে য়্যারেসী (Araceae) গোষ্ঠীর এই পানার যে প্রজাতিটি সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায় তা' হ'ল—***পিস্টিয়া স্ট্রাটিয়োটিস্*** (Pistia stratiotes)।

টোপাপানা মিঠে জলের অধিবাসী। সাধারণতঃ এই পানা গ্রামের পুকুর, ডোবায় বা অন্যবিধ পয়ঃপ্রণালীতে হাল্কা সবুজ আস্তরণে ঢেকে রাখে এদের

সুন্দর পাতার সাজানো স্তবক দিয়ে। অবৃন্তক ডিম্বাকৃতির পত্রগুলি খুবই সন্নিহিত ভাবে সাজানো থাকে প্রায় কাপ বা বাটীর আকারে, কারণ এদের সুনির্দিষ্ট দেহকাণ্ড নেই। গ্রন্থিকাণ্ডেই এই পত্র সজ্জিত থাকে ও মূল সন্নিবিষ্ট থাকে। মূলগুলি চুলের গুচ্ছের মত এবং মূলগাত্র হ'তে অসংখ্য ছোট ছোট মূলরোম নির্গত হয়। এই মূলরোমেই অন্যান্য সাধারণ উদ্ভিদের মতই আহার সংগ্রহ করে। তবে এই উদ্ভিদ জলজ হওয়ায়, জলে দ্রবীভূত খাদ্যগুলি আহরণ করে ও জলকে অনেকাংশে দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। পুষ্পস্তবকগুলি বিশেষ ধরনের মঞ্জরীর (spadix) উপর সাজানো থাকে। সপুষ্পক উদ্ভিদ শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় যৌন প্রজনের দ্বারা বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই হতে পারে। তবে অযৌন উপায়ে গ্রন্থিকাণ্ডের বৃদ্ধির দ্বারাই এদের প্রসার হয় বহুলাংশে।

এই পানাকে নিয়মিত ভাবে সংগ্রহ করে যেমন জলাধারের জলকে এদের প্রাকৃতিক পচন ও জলদূষিত করণের হাত থেকে বাঁচানো যায় তেমনই সঠিক ভাবে তাকে জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

5.3.2 **ক্ষুদে পানা :** ক্ষুদ্রাকৃতির কয়েকটি প্রজাতির পানাকে সপুষ্পক উদ্ভিদ বলে ভাবতে অসুবিধা হয়। কারণ এদের সুসংগঠিত শারীর সংস্থান নিরূপণ করাই কঠিন। কিন্তু উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এদের সপুষ্পক উদ্ভিদ শ্রেণী বলে বিবেচনা করতে হয়। এরা সকলেই Lemnaceae গোষ্ঠীভুক্ত। ইংরাজীতে এদেরকে সাধারণ ভাষায় 'ডাক্ উইড্' (Duck weed) বলা হয়। কারণ হাঁস জাতীয় জলচর পাখীদের এই পানা একটি প্রিয় খাদ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রধানতঃ তিনটি গণের কয়েকটি প্রজাতি এই ক্ষুদেপানা হিসাবে অভিহিত।

5.3.3. **স্পাইরোডেলা** (Spirodela) : এ হ'ল একটি উদ্ভিদ বিভাগের গণের (genus) বৈজ্ঞানিক নাম। আমাদের দেশে সচরাচর যে প্রজাতিটি দেখা যায় তার নাম হ'ল—**স্পাইরোডেলা পলিরাইজা** (Spirodela polyrrhyza)। মটর দানার আকার বিশিষ্ট পত্রযুক্ত, 0·75—1·0 সেমি. ব্যাসযুক্ত এই জলজ উদ্ভিদটি মিঠে জলের আধারে অর্থাৎ পুকুর, ডোবা, ইত্যাদি জলাধারে ভাসমান অবস্থায় থাকে। পত্র বা ইংরাজীতে এর বিশেষ নামকরণ হয়েছে ফ্রণ্ড্ (frond)—অর্থাৎ হিসাবে প্রায় ডিম্বাকৃতির ন্যায়। তিন বা চারটি এমন পত্র অতি ক্ষুদ্র সূত্রবৃন্তের দ্বারা যুক্ত থাকে। এই পত্রগুলির উপরিতল গাঢ় সবুজ কিন্তু তলদেশ বাদামী বা মেটে লাল রঙের হয়। প্রতিটি পত্রের নীচে থেকে

তিন চারটি 1·5-2·5 সেমি. লম্বা সুতার মত মূল ঝুলতে থাকে যা' স্বাভাবিক ভাবেই জলে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে ও জলে দ্রবীভূত খাদ্য আহরণ করে। সাধারণতঃ, পচা জলাশয়ে, অর্থাৎ যে জলাশয়ে জৈব ও অজৈব সার থাকে তেমন জায়গাতেই এই মটর ডাল পানার আধিপত্য দেখা যায়।

যৌন ও অযৌন উভয়বিধ জনন প্রক্রিয়ার দ্বারাই পানার বিস্তার লাভ হয়। অনুকূল পরিবেশে পাতার নিচের দিকের খাঁজে কতকগুলি অংকুর দেখা যায়। এই অংকুরই পরে পাতায় পরিণত হয়। জলাধারে অভিপ্রেত পরিমাণ সার বস্তুর উপস্থিতিতে এই পাতা 25-30 দিনের মধ্যেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ও পরে বিবর্ণ বা হলুদ রঙ-এর হয়ে গিয়ে পচতে শুরু করে ও ধীরে ধীরে জলের নীচে ডুবে যায়।

5.3.4. **লেমনা** (Lemna spp.) : এরা আকারে খুবই ছোট ও প্রায় 2-4 মিমি. ব্যাস বিশিষ্ট। এদের পাতা প্রায় বৃক্কের বা আঁশের আকৃতির, অসমবিভক্ত ও চ্যাপ্টা। প্রতি পত্রের বা ফ্রণ্ডের নিচে একটি মাত্র মূল ঝুলতে দেখা যায় যা' লম্বায় প্রায় 1-2 সেমি.। পত্রগুলির উপরিভাগ গাঢ় সবুজ রঙ-এর। পত্রবৃন্তের ন্যায় সরু সরু সুতোর মত অংশ দিয়ে তিন চারটি পত্র একত্র যুক্ত থাকে। সাধারণতঃ **লেমনা পারপুসিলা** (Lemna perpusilla) ও **লেমনা ট্রাই-সালকা** (Lemna trisulca) এই দুইটি প্রজাতিই ভারতে দেখা যায়। শেষোক্ত প্রজাতিটি জলে ডুবন্ত অবস্থায় ভাসমান থাকে। এর পত্রগুলি লম্বাটে আকৃতির, শাখাপ্রশাখাযুক্ত ও খাঁজকাটা এবং সদ্য সৃষ্ট পত্রগুলি প্রাথমিক অবস্থায় ত্রিশূলাকৃতি থাকে।

এই পানাও অপরিস্কার জলে অর্থাৎ জৈব পদার্থ দ্রবীভূত জলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় অর্থাৎ যাকে চলিত বাংলায় 'এঁদো পুকুর' বলে সেই ধরনের জলাশয়েই এই পানা দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। এদের বংশ বিস্তার ও প্রসার যৌন ও অযৌন উভয় প্রকারেই হ'তে পারে। তবে অযৌন প্রজননই এদের বৃদ্ধির প্রধান উপায়। অনুকূল পরিবেশে 20-30 দিনে এরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে স্বাভাবিক ভাবে পচে যায়।

5.3.5. **উলফিয়া** (Wolfia spp.) : লেমেনসী গোষ্ঠীর সচরাচর দৃষ্ট পানাগুলির মধ্যে এই পানাই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। এর প্রধান প্রজাতিটির নাম হল—**উলফিয়া য়্যারাইজা** (wolfia arrhiza)। এদের পত্র বা ফ্রণ্ডগুলি খুবই ক্ষুদ্র, প্রায় সুজির মত। তাই একে সুজি পানাও বলা হয়ে থাকে। প্রতিটি পত্র 1-4 মিমি. হ'তে পারে, তবে মূলহীন। পাতাগুলি গোলাকার কিম্বা ডিম্বাকৃতির

এবং বাটি বা কাপের ন্যায় উপরের দিকটা গর্তমত। অংকুরিত মুকুলই প্রসার বা বিস্তারের প্রধান অর্থাৎ অযৌন প্রজননেই বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে এই পানার। যৌন পদ্ধতিতেও প্রজনন হতে পারে।

লেম্নেসী গোষ্ঠীর উক্ত পানাগুলির সাধারণ প্রকৃতি অনুসারে ক্রমাগত জীবনবৃত্ত পূরণ ও পচন এবং জলাশয়ে তার সঞ্চয়ন জল দুষনের কারণ হয়ে থাকে। তবে স্বাভাবিক ভাবে দেখা গেছে যে এই পানা হাঁসের একটি প্রিয় খাদ্য এবং হাঁসের অন্যতম খাদ্য শামুকগুলিও এই পানার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল তাদের আহারের প্রয়োজনে। কাজেই হাঁস পালনে এই পানার উপযোগিতা দেখা যায়। তবে হাঁসের ও শামুকের খাদ্যের পরিমাণের চেয়ে এই পানার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বেশী হওয়ায় তা' জলদূষণের কারণ হ'য়ে পড়ে। কাজেই এই পানাগুলির পরিমিত ও পরিকল্পিত সংগ্রহণ ও পচনের দ্বারা জৈব সারের প্রয়োজন অনেকাংশে মেটানো যেতে পারে।

এই ক্ষুদ্রাকৃতি উদ্ভিদ সপুষ্পক এবং সজীব অবস্থায় জলের উপর ভেসে থাকে কিন্তু পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলে বা যখন পচতে শুরু করে তখন ঠিক জলতলের নীচে ভাসমান অবস্থায় থাকে। জীবন্ত অবস্থায় এই পানা জলের উপর একটা পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করে। এই পানা সাধারণতঃ জৈব পদার্থপূর্ণ অগভীর বদ্ধ জলায় বেশী হয় তবে খুব ধীরে প্রবহমান নালার জলেও জন্মাতে দেখা যায়।

বদ্ধ জলার পরিবেশে এই পানা লক্ষণীয় ব্যবহারিক ভূমিকা পালন করে। "ঘেসো পোনা মাছ" বা গ্রাস কার্পের (Grass Carp) [Ctenopharyngodon idella] পক্ষে এই পানা একটি পুষ্টিকর খাদ্য। এর জলীয় অংশের পরিমাণ 90-93% হলেও (নস্কর ও চক্রবর্ত্তী, 1985) শুকনো ওজনের অনুপাতে দেখা যায় এর আমিষ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ 32·2% (নস্কর ও ঘোষ, 1985) যা' ঘেসো পোনার শারীরিক বৃদ্ধিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। এমন পানায় ভরা বদ্ধ জলায় বেড়ে ওঠা ঘেসো পোনা জলীয় পরিবেশে গঠনশীল পরিবর্তন আনে। বাস্তব খাদ্যশৃঙ্খলের পরবর্তী ধাপগুলিতে যে সব জীব পরপর আসে তাদেরও বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। যেমন ঘেসো পোনার মল জলে সারের কাজ করে, ফলে ভাসমান জীবের (Plankton) পরিমাণ বাড়ে। এই ভাসমান জীব আবার অন্যান্য সাধারণ পোনা মাছের আহার হিসাবে ব্যবহার হয়; উপরন্তু ঘেসো পোনার জল সরাসরিভাবে খেয়ে পুষ্টি লাভ করে (সেন ও সহকর্মীবৃন্দ, 1978)।

বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই এই পোনা খুব বেড়ে ওঠে। এর উৎপাদনের পরিমাণ সাধারণতঃ সবচেয়ে বেশী হয় 14-22 সপ্তাহের মধ্যে। এই উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব যদি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কয়েকবার ড্রেনের ময়লা জল বদ্ধ জলায় জন্মানো পানায় প্রয়োগ করা হয়। তবে পানার খুব ঘন আস্তরণ সৃষ্টি হলে অন্যান্য জীবের পরিমাণ কমে যায়।

নস্কর ও সহকর্মীবৃন্দ (1986) লক্ষ্য করেছেন যে দেশী বিদেশী নানা ধরনের পোনা মাছের চারা (fry and fingerlings) প্রচুর পরিমাণে এই পানা খায়। কিছু বিদেশী পোনা বড় হয়েও ওই পানা খায়। এই অবস্থায় এই সব পোনা মাছের মল জলের বিভিন্ন ভাসমান জীবের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, বিশেষ করে, Spirulina spp., Anacystis spp., Euglena spp., Eudorina spp., Peridinium spp., Chlamydomonas spp., Pandorina spp., Volvox spp., Cosmarium spp., Scenedesmus spp. এবং Zooplankton-Brachionus spp., Cyclops spp., Filinia spp., এবং Keratella spp.

ভাসমান নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। উদ্ভিদভোজী ঘেসো পোনা এই পানাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশী বাড়লেও অন্যান্য ঐজাতীয় দেশী পোনামাছ যেমন রুই, মৃগেল, ইত্যাদিও বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। পরীক্ষার হিসাবে দেখা গেছে, প্রতি হেক্টরে 5.3 টন এই পানা 143 দিন খেয়ে ঘেসো পোনার উৎপাদনের পরিমাণ হয় 4·058 টন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

REFERENCES

Aiyer, R. S. ; Salahudden, S. and Venkataraman, G. S. 1972. On a long term algaliration field trial with high yielding rice varieties : Yield and economics. Indian J. agric. Sci. 42 : 380-83.

Annual Report, 1971. CRRI. P. 120-27.

Annual Report. 1975. CRRI. P. 184-87.

Arora S. K. 1969. The role of algae on the availability of phosphorus in paddy fields. Riso : 18 : 135-38.

Ashton, P. J. and Walmsley, R.D. 1976. The aquatic fern Azolla and its Anabaena symbiont. Endeavour, 35 : 39-43.

Becking, J.H. 1979 Environmental requirements of Azolla for use in Tropical Rice Production. Symposium on Nitrogen and Rice, Intl. Rice Res. Inst., Philippines. P. 31.

Chopra, T.S. and Dube, N. 1971. Changes of nitrogen content of a rice soil inoculated with *Tolypothrix tenuis*. Pl. Soil 35 : 453-62.

Das, B. and Singh, P.K. 1977b. Detoxication of the pesticide benzene hexa chloride by blue-green algae. Microbiosl.

Das, N.C. 1989. *Azolla pinnala*—The potential Bio-fertilizer in rice production. Ph.D. thesis, Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, Mohanpur, W.B. P. 156.

De, P.K. and Sulaiman, M. 1950. Fixation of nitrogen in rice soils. by algae as influenced by crop, Co_2 and inorganic substances. Soil Sci. 70 : 132-51.

De, P.K. and Mandal, L.N. 1956. Fixation of Nitrogen by algae in rice Soils. Soil Sci. 81 : 453-58.

Espinas, C.R. ; Berja, N.S.. ; del Rosario, D.C. and Watanabe, I. 1979. Environmental conditions affecting *Azolla* growth. IRRI Saturday Seminar.

FAO, 1979. China : Recyling of organic wastes in agriculture. FAO Soils Bull. 40.

Fletcher, J. E. and Martin, W.P. 1948. Some effects of algae and molds in the rain crust of desert soils. Ecology, 20 : 95-100.

Gonzales, E.A. and Gangla, K.S. 1949. observation of the algae of paddy Soils. Bombay U.J. Sec. B. Biol. Sci. (N.S.) 18:51-59.

Jha, K. K. ; Ali, M.A. ; Singh, R. and Bhattacharyya, P.B. 1965. Increasing rice population through the inoculation of *Tolypothrix tenuis,* a N_2 fixing blue-green algae. J. Indian Soc. Soil Sci. 13 : 161-66.

Kar, S. and Singh, P.K. 1977. Toxicity of carbofuran to blue-green alga Nostoc muscorum. Bull. Environ. Contam. Toxicol.

Liu, C.C. 1979. The use of Azolla in rice production in China. In Nitrogen and Rice. Intl. Rice Res. Inst. Los Banos, Philippines : P. 375-94.

Madholkar, N.J., Sahay, M.N. and Sankaram, A. 1968. Effect of blue-green algae and urea spray on high yielding varieties. Oryza, 5 : 59-62.

Mandal, B.K and Bharati, A.K. 1983a. Studies on multiplication of Azolla. IRR. Newsl. 8(1) : 21-22.

Mandal, B.K. and Bharati, A.K. 1983b. *Azolla pinnata* as an organic manure for rice in West Bengal. Indian J. agric. Sci. 53 (6) : 472-75

Marathe, K.V. 1972. Role of some Blue green-algae in soil aggregation. In Taxonomy and Biology of Blue-green algae (T.V. Desikachary, ed.) University of Madras, Madras, P. 328-31.

Mitra A.K. 1951. The algal flora of certain Indian Soils. Indian J. agric. Sci. 21 : 357

Moore, A. W. 1969. Azolla : Biology and agronomic significance. Bot. Rev. 35 : 17-34.

Naskar, K.R. and Chakraborty, N.M. 1985. Studies on the family Lemnaceae from Lower Ganga Delta. Bull. Bot. Soc. Bengal, 38.

Naskar, K.R. and Ghosh, A. 1985. Role of *Wolffia arrhiza* (L.) as fish-food and its influence on algal food-chain. Natl. Seminar Biol. Algae, Poona Univ. 8-10 Feb. 1985 : 14 (Abstr.).

Naskar, K.R. ; Banerjee, A.C. ; Chakraborty, N.M. and Ghosh, A. 1986 Yield of *wolffia arrhiza* (L.) from cement cisterns with different sewage concentrations, and its efficacy as a carp feed. Aquaculture, 51 : 211-16.

Nguyen, C.T. 1930. The Azolla plant cultivated for use as a fertilizer. Bull. Econ. Indochine (Hanoi), 33:335-50.

Nishigaki, S. ; Shibuya, M. and Kodaira, K. 1951. J. Sci. Soil Manures, 22:69.

Nishigaki, S. ; Shibuya, M. and Kodaira, K. 1953. J. Sci. Soil Manures, 23:150.

Pandey, D.C. 1965a. A study of the algae from Paddy soils of Ballia and

Ghazipur Districts of Uttar Pradesh, India 1. Cultural and ecological considerations. Nova Hedwigia, 9 : 299-334.

Pandey, D.C. 1965b. A Study of the algae from paddy soils of Ballia and Ghazipur districts of Uttar Pradesh, India. II. A Taxonomic considerations—Cynophyceae. Nova Hadwigia Z. kryptogamenk, 10 (1/2): 177-209.

Patnaik, H. 1966. Growth and nitrogen fixation by *Westiellopsis prolifica.* J. Ann. Bot. (N.S.), 30 : 231-38.

Patnaik, U. and Singh, P.K. 1977. Effect of nitrate nitrogen on the growth, heterocyst and nitrogen fixation of rice fields blue-green alga *Geoeotrichia* sp. Algological studies.

Rains, D.W. and Talley, S.N. 1978. Use of Azolla as a source of N for temperate zone rice culture. Proc. 2nd Rev. Meeting. East-West Resource Syst. Inst. 167-73.

Rains, D.W. and Tally, S.N. 1979. Uses of Azolla in North America. In Nitrogen and Rice. Intl. Rice Res. Inst. Los Banso, Philippines P. 419-31.

Relwani, L.L. 1965. Response of paddy varieties to Blue green algae and methods of propagation. Curr. Sci. 34 : 15.

Relwani, L.L. and Manna, G.B. 1964. Effect of Blue-green algae in combination with urea on paddy field. Curr. Sci. 33 : 687.

Relwani, L.L. and Subrahmaníyan, R. 1963. Role of Blue-green algae, chemical nutrients and partial soil sterilization on paddy field. Curr. Sci. 32 : 441-43.

Roger, P. 1972. Bibliography on the problem of N_2 fixation by Cynnophyceae (in French) Dakar Senegal, ORSTOM, P. 48.

Sahay, M.N. 1966. Nitrogen uptake by the rice crop in the experiments with blue-green algae. Proc. Indian Acad. Sci. 63 : 223-33.

Sankaram, A. 1967. Blue Green algae-role in culture. Farmer parliament, ment, 2:9-10.

Sankaram, A. 1971. Work done on Blue-green algae in relation to Agriculture. ICAR, New Delhi.

Sankaram, A. Mudhalkar N.J. and Sahoy, M.N. 1967. Inoculation of Blue-green algae on the yield of rice under field conditions. Indian J. Microbiol. 7 : 57-62.

Saha, K.C. and Mandal, L.N. 1980a. A green house study on the effect of inoculation of N-fixing Blue-green algae in an alluvial soil trea-

ted with P and Mo on the yield of rice and changes in the N-content of Soil. Pl. Soil, 57:23-30.

Saha, K.C. and Mandal, L.N. 1980b. Effect of inoculation with Nitrogen-fixing Blue-green algae on the population of total bacteria, Azotobacter and phosphate solubilizing bacteria in partial sterilized waterlogged rice soil. J. Indian Soc. Soil Sci. 28(3) : 375-80.

Saha, K.C. ; Panigrahi, B.C. and Singh, P.K. 1982. Blue-green algae or Azolla additions on the nitrogen and phosphorus availability and redox potential of a flooded rice soil. Soil Biol. Biochem. 14:23-26.

Saha, K.C. ; Sannigrahi, S. ; Bandopadhyay, S.K. and Mandal, L.N. 1984. Effect of phorate on nitrogen fixation by Blue-green algae. J. Indian Soc. Soil Sci. 32:79-83.

Sawatdee, P., Sutanum, W., Chermsiri, C., Kanareugsa and Takahashi, J. 1978. Effect of Azolla as a green manure crop on rice yields in North Eastern Thailand. IRR. Newsl. 3(3) : 22-3.

Sen, P.R. ; Rao, N.G.S. ; Chakraborty, R.D. ; kar, S.L. and Jena, S. 1978. Effect of additional fertilizers and vegetations on growth of major Indian carps in ponds containing grass carp. Prog. Fish. cult. 40 (9):69 70.

Singh, R.N. 1950. Reclamation of "Usuar" lands in India through blue-green algae. Nature, 165 : 325-26.

Singh, R.N. 1961. The role of Blue-green Algae in Nitrogen Economy of Indian Agriculture. ICAR, New Delhi, p. 131.

Singh, P.K. 1971. CRRI Annual Report. p. 120-27.

Singh, P.K. 1973. Nitrogen fixation by the unicellular Blue-green alga *Aphanothece*. Arch. Mikrobiol. 92:59-62.

Singh, P.K. 1974a Effect of pH on growth and nitrogen fixation in *Aphonothece* (cyanophyta). Oikos, 25:114-16.

Singh, P.K. 1975a. Photoreactivation of UV-irradiated Blue green algae and algal virus LPP-1. Arch. Mikrobiol. 103 : 297-302.

Singh, P.K. 1975b. Fertilizer tolerance of blue-green algae and their effect on heterocyst differentiation. Phykos, 14 :81-88.

Singh, P.K. 1976a. Growth and nitrogen fixation of mutants defective in heterocyst differentiation in the blue-green alga *cylindrospermus* sp. Zeitschrift fur Allg. Mikrobiol. 16 : 453-63.

Singh, P.K. 1976b. Growth and nitrogen fixation of a mutant of Bule-green algae *Wollea bhanadwajae* defective in heterocyst development. Biochem. Physiol. Pflanzen, 170 : 237-42.

Singh, P.K. 1976c. Algal inoculation and its growth in water logged rice fields. Phykos, 15.

Singh P.K. 1977a. Multiplication and utilization of fern "Azolla" containing nitrogen—fixing algal symbiont as green manure in rice cultivation. Riso, 36: 125-37.

Singh, P.K. 1977b. Growth and nitrogen fixation of unicellular Blue-green alga *Aphanothece castagne,* Biol. Plant. 19: 156-57.

Singh. P.K. 1977c. Biology and agronomic significance of *Azolla Anabaena* symbiotic nitrogen fixation. Proc. Indian Sci. Cong. Botany Section. P 41.

Singh. P.K. 1979. Use of Azolla in rice production in India. In Nitrogen and Rice. Intl. Rice Res. Inst. Los Bonas, Philippines: P. 407-18.

Singh. P.K. and Subudhi, B.P.R. 1977. Save food, use Azolla as Poultry feed. Indian Fmg : 27 :

Sircar, S.N. and Ray, A. 1961. Growth substances separated from the root of water hyacinth by paper chromatography. Nature, Lond. 190: 1213-14.

Stewart, W. D. P. 1979. Present day nitrogen fixing plants. Ambio. 6: 166-73.

Stewart, W. B. P. and Singh, H.N. 1975. Tranfer of nitrogen fixing (nif) genes in the blue-green alga *Nostoc* muscorum. Biochem. Biophys. Res. Commun. 62: 62-69

Subrahmanyan, R. 1972. Some observations on the utilisation of blue-green algae mixtures in rice cultivation in India. In Taxonomy and Biology of Blue-green Algae, University of Madras, P. 281-93.

Subudhi, B.P.R. and Singh, P.K. 1978a. Heterocyst spacing in the symbiotic Blue-green Alga *Anabaena azollae.* Curr. Sci. 47(4): 510-11.

Subudhi, B.P.R. and Singh, P.K. 1978b. Nutritive value of water fern *Azolla pinnata* for Chicks. Poultry Sci. 57(2) : 378-80.

Subudhi, B.P.R. and Singh, P.K. 1779. Effect of macronutrients and pH on the Growth, Nitrogen Fixation and Soluble Sugar Content of Water Fern *Azolla pinnata.* Biol. Plant. 21 (1) : 66-70.

Subudhi, B.B.R. and Watanabe, I. 1979. Minimum level of phosphate in water for growth of Azolla determined by continuous flow culture. Curr. Sci. 48(24) : 1065-66.

Sundara Rao, W.V.B. ; Goyal, S.K. and Venkataraman, G.S. 1963. Effect of inoculation of *Aulosira fertilissima* on rice plant. Curr. Sci. 32: 366.

Talley, S.N. and Rains, D.W. 1979. Uses of Azolla in North America. In

Nitrogen and Rice, Intl. Rice Res. Inst. Los Banes, Philippines, P. 419-31.

Talley, S.N. and Rains, D.W. 1980. Azolla as a Nitrogen source for temperate Rice. Nitrogen Fixation, 2 : 311-20.

Talley, S.N. and Rains, D.W. 1980. *Azolla filiculoides* Lam. as a Falo-low—Season Green Manure for Rice in a Temperate climate. Agron. J. 72 : 11-18.

Talley, S.N. Talley, B.J. and Rains, D.W. 1977. Nitrogen fixation by Azolla in rice fields. In A. Hollander—Genetic. Engineering in Nitrogen Fixation. Plenum Press, New York, P. 259-81.

Tran, Q.T. and Dao, T.T. 1973. Azolla : A green compost. Vietnames Studies. Agric. Prob. 38: 119-27.

Venkataraman, G.S. 1975. The role of blue-green algae in tropical rice cultivation. In Nitrogen Fixation by Free-living Micro organisms (W.D.P. Stewart, Ed.) Cambridge Univ. Press. P. 207-18.

Watanabe, I. 1978. *Azolla* and its use in Low land Rice Culture. Soil Microbe, 20 1-10.

Watanabe, I. ; Berja, N.S. and Rosario, D.C.D. 1980. Growth of Azolla in paddy field as affected by phosphorus fertilizer. Soil Sci. Pl. Nutr. 26 (2) : 301-7.

পরিভাষা

Abiotic component—অজৈব অংশ
Agro-ecosystem—কৃষি পরিমণ্ডল
Algae—শৈবাল
Algal filament—শৈবাল সূত্র
Alternate host—অন্তবর্তী পোষক
Angiospermae—গুপ্তবীজী
Artificial ecosystem or man altered ecosystem—কৃত্রিম বা মনুষ্য পরিবর্তিত পরিবেশ

Bacteria—বীজাণু
Bengal terror—বাঙলার আতঙ্ক
Blue green algae—নীলাভ-সবুজ শৈবাল
Biocontrol method—জৈব দমন পদ্ধতি
Biological filter—জৈব পরিস্রাবক
Biomass—জৈব উপাদান
Biosphere—জৈব মণ্ডল
Biotic component—জৈব অংশ
Blue devil—নীল দানব

Calorific value—তাপ মূল্য
Cation exchange capacity—ধনাত্মক আয়ন পরিবর্ত ক্ষমতা
Chlorophyll—সবুজ রঞ্জক পদার্থ
Chloroplast—সবুজ কনিকা
Commercial feed—প্রস্তুত খাদ্য
Continuous flow culture—প্রবহমান আবাদ
Critical concentration—আবশ্যকীয় ঘনত্ব
Crude—কাঁচা

Crude fat—স্নেহজাতীয় পদার্থ
Crude fibre—অবিভাজিত তন্তু
Crude protein—আমিষ জাতীয় পদার্থ
Cryptogams—অপুষ্পক উদ্ভিদ শ্রেণী

Decomposition—পচন
Dual cropping—দ্বৈত আবাদ

Ecological chaos—বাস্তব্য বিদ্যাগত বিপর্যয়
Ecosystem—বাস্তুরীতি
Establishment—আরোপণ
Exchangeable—বিনিময়যোগ্য
Exponential growth rate—বৃদ্ধির সূচকীয় হার

Factors—শর্ত
Family—গোষ্ঠী
Fermentation chamber—বিজারণ কক্ষ
Fibro-vascular bundle—তন্তুগুচ্ছ
Filament—দেহরজ্জু
Filamentous—সূত্রাকার
Fine sand—মিহি বালু
Free living—স্বজীবি বা মুক্তজীবি
Frond—পল্লব
Fry and fingerlings—পোনা মাছের চারা
Fungi—ছত্রাক

Garden soil—বাগান জমি
Gastropoda—শামুক (কম্বোজ প্রাণী)
Gelatinous sheath—আঠালো আবরণ
Genetic—জীন তাত্ত্বিক

Genus—গণ
Geographical distribution—ভৌগোলিক ব্যাপ্তি
Grass carp—ঘেসো পোনা মাছ
Growth—বৃদ্ধি
Growth hormone—বৃদ্ধি উত্তেজক
Gymnospermae—ব্যক্তবীজী

Heterocyst—শৈবালসূত্রে এক বিশেষ ধরনের বিবর্তিত কোষ যা বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণে সক্ষম

Inoculation—অনুপ্রবেশন
Inoculum—বীজন

Lag period—বিরাম কাল
Lamellate—স্তরীভূত
Leguminous—শুঁটি জাতীয়
Light intensity—আলোক ঔজ্জ্বল্য

Marker—বৈশিষ্ট্য
Megasporangia—স্ত্রী অনুবীজ কাণ্ড
Megasporocarp—স্ত্রী জনন দণ্ড
Membrane—আচ্ছাদন বা আস্তরণ-ঝিল্লি
Metabolism—বিপাক
Microsporangia—পুরুষ অনুবীজ কাণ্ড
Microsporangium—বীজন থলি
Microsporocarp—পুং জনন দণ্ড
Monocotyledonae—একবীজ পত্রী
Multiplication—সৃজন বৃদ্ধি .

Nitrogen fixing gene বা Nif gene—নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণে নির্দিষ্ট জীন

Nodule—শিকড় গুটি

Oxidation—জারণ
Oxidisable—জারণযোগ্য

Pellet—চাঙ (দানা)
pH—হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্ব
Phytomass—উদ্ভিদ জৈব উপাদান
Pigment—রঞ্জক
Plankton—ভাসমান জীব
Polar nodule—প্রান্তীয় গুটি
Powar stationary engine—গ্যাস স্থাণু ইঞ্জিন
Production—সৃজন
Prokyote—পুরাশারী বৃত্তের বা প্রাকৃত কোষ সমন্বিত এক কোষী উদ্ভিদ
Protozoa—এক কোষী প্রাণী
Pterydophyta—ফার্ণজাতীয়

Quantum flux—কোয়াণ্টাম প্রবহণ

Radiant energy—সূর্যের বিকীর্ণ শক্তি
Rainfed—বারিপুষ্ট বা বৃষ্টিসেবিত
Reduction—বিজারণ
Residual effect—অবশিষ্ট প্রভাব
Rhizome—গ্রন্থিকাণ্ড
Rotting—পচন

Seed—বীজ
Selective herbicide—নির্বাচিত আগাছানাশক ঔষধ
Simple correlation—সরল অনুবন্ধ
Soil amelioration—মাটির স্বাভাবিকতা আনয়ন

Soil texture—মাটির বিন্যাস

Spadix—মঞ্জরী

Species composition—প্রজাতি সংগঠন

Spore—বীজন, অনুবীজ

Sporocarp—জননাঙ্গ, অনুবীজ, রেণুস্থালী গুচ্ছ

Strain—জাত

Sub-kingdom—উপ-জগৎ

Virus—বিষাণু

Water culture—জলাধারের আবাদ

Water hyacinth—কচুরীপানা

Weed—আগাছা

Zoomass—প্রাণীকুল

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা / লাইন / সারণী		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
2 পৃঃ	18 নং লাইন	আর্যসামাজিক	আর্থসামাজিক
	19 নং লাইন	বাস্তব্যতত্ত্বীয়	ব্যাস্তব্যতত্ত্বীয়
3 পৃঃ	7 নং লাইন	Abiotic Component	Abiotic component
4 পৃঃ	14 নং লাইন	বাস্তব্যতত্ত্বীয়	বাস্তব্যতত্ত্বীয়
5 পৃঃ	2 নং লাইন	ব্যস্তব্যতত্ত্বীয়	বাস্তব্যতত্ত্বীয়
8 পৃঃ	8 নং লাইন	Ricch	Ricci
10 পৃঃ	2 প্যারা 1 নং লাইন	Lam	Lam (Roman)
12 পৃঃ	10 নং লাইন	প্রচারের	প্রগারের
13 পৃঃ	4 নং লাইন	নাইট্রোজেন গত	নাইট্রোজেনগত
21 পৃঃ	4 নং লাইন	P_2O5	P_5O_5
	11 নং লাইন	K_2HPO4	K_2HPO_4
	17 নং লাইন	P_2O5	P_2O_5
24 পৃঃ	সারণী নং 1	p / kg / ha	P / kg / ha
	9 নং লাইন	ফিলিকুলয়ডিস্	**ফিলিকুলয়ডিস্**
	3 প্যারা 3 নং লাইন	PH	pH
26 পৃঃ	2 প্যারা 3 নং লাইন	**যা**	যা
27 পৃঃ	2 প্যারা 10 নং লাইন	Talley, et al.,	Talley et al.,
28 পৃঃ	3 নং লাইন	অন্থ প্রবেশনের	অন্থ প্রবেশনে
34 পৃঃ	5 লাইন	শুবুদ্ধি ও সিং 1977	সুবুদ্ধি ও সিং, 1978b
39 পৃঃ	3 নং লাইন	আবাদে	আবাদ
43 পৃঃ	3 নং লাইন	22-28c°	22-28°C
52 পৃঃ	10 নং লাইন	অকৃত্রিম	কৃত্রিম

53 পৃঃ 3 প্যারা 3 নং লাইন	Species Composition	Species composition
54-55 পৃঃ সারণী নং 6	Spp.	spp.
57 পৃঃ 2 প্যারা 3 নং লাইন	Garden Scil	Garden soil
58 পৃঃ 1 নং লাইন	T tenuis	**T. tenuis**
13 নং লাইন	বিক্রিয়ার (oxidation) ফলে বিক্রিয়াযোগ্য	জারণের (oxidation) ফলে জারণযোগ্য
3 প্যারা	(oxidisable)	(oxidisable)
62 পৃঃ 2 নং লাইন	বিষয়ে ও	বিষয়েও
65 পৃঃ 3 প্যারা 1 নং লাইন	কাচ	কাঁচ
67 পৃঃ 12 নং লাইন	মাটির	মাটি
68 পৃঃ 4 প্যারা 6 নং লাইন	বিশেয়	বিশেষ
69 পৃঃ 3 নং লাইন	ফরে	করে
73 পৃঃ 3 প্যারা 2 নং লাইন	ব্যবহার্য্য	ব্যবহার্য
74 পৃঃ 2 প্যারা 1 নং লাইন	দেথা	দেখা
75 পৃঃ 9 নং লাইন	পূর্নভাবে	পূর্ণভাবে
10 নং লাইন	উদ্বিদভোজী	উদ্ভিদভোজী

—

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত
বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। বহুমুখী মাপকাঠিতে কর্মসিদ্ধান্ত/বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়/১০·০০
২। ভারতে ভূবিদ্যার ক্রমবিকাশ/দীপঙ্কর লাহিড়ী/১১·০০
৩। আকাশের গুপ্তচর ঃ র‍্যাডার/সুশীলচন্দ্র ঘোষ/১১·০০
৪। বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে/অজিত চৌধুরী/৭·০০
৫। জীবজগতের বিচিত্র সংবাদ/হরিমোহন কুণ্ডু/৮·০০
৬। গঙ্গাপথের ইতিকথা/অশোককুমার বসু/১৬·০০
৭। অম্লমাটি ও তার তত্ত্বাবধান/দিলীপকুমার দাস ও দীপঙ্কর সাহা/১০·০০
৮। বার্ধক্য ও সমাজমন/অসীম বর্ধন/৬·০০
৯। সারতৈরী ও ব্যবহার/সত্যরঞ্জন বিশ্বাস/৯·০০
১০। সন্ধান/সংকর্ষণ রায়/৭·০০
১১। ক্যাকটাস ও ফুলচাষ/বলাইলাল জানা/১২·০০
১২। কি দিয়ে সমস্ত কিছু গড়া/পলাশবরণ পাল/১০·০০
১৩। সমুদ্র পরিচয়/প্রসাদ সেনগুপ্ত/৮·০০
১৪। শুষ্ক ও খরা এলাকার চাষ পদ্ধতি/শ্রীবিমলবিহারী দাস ও শ্রীবলাইলাল জানা/১৮·০০
১৫। জিওল মাছ/শ্রীশচীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়/১২·০০
১৬। সৌরশক্তি/আনন্দকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/৯·০০
১৭। আবহাওয়া ও আমরা/অপরাজিত বসু/১০·০০
১৮। আমাদের জীবনে পাখি/সুধীন সেনগুপ্ত/১৪·০০
১৯। নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র/সুশীল ঘোষ/১২·০০
২০। ঘরে করো, শিল্প গড়ো/তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়/১২·০০
২১। জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান/শ্যামল বণিক/১২·০০
২২। এফিড্ বা জাবপোকা/মনোজরঞ্জন ঘোষ/১২·০০
২৩। পাতালের ঐশ্বর্য/সংকর্ষণ রায়/১০·০০

এগারো টাকা